খাঁটি মুমিনের সহীহ্ জয্‌বা

অধ্যাপক গোলাম আযম

খাঁটি মুমিনের সহীহ্ জয্বা

অধ্যাপক গোলাম আযম

প্রকাশনা বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
৫০৪/১ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার
ঢাকা-১২১৭, ফোন ঃ ৮৩৫৮৯৮৭

www.amarboi.org

খাঁটি মুমিনের সহীহ্ জয্বা

—— অধ্যাপক গোলাম আযম

প্রকাশক ঃ আবু তাহের মুহাম্মদ মা'ছুম
চেয়ারম্যান, প্রকাশনা বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
৫০৪/১ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
ফোন ঃ ৮৩৫৮৯৮৭, ৯৩৩১৫৮১, ৯৩৩১২৩৯

প্রথম প্রকাশ ঃ জুলাই - ১৯৯২

১৫তম মুদ্রণ ঃ মার্চ - ২০১৫
চৈত্র - ১৪২১
জমাদিউস সানি - ১৪৩৬

নির্ধারিত মূল্য ঃ ২০.০০ (বিশ) টাকা মাত্র।

মুদ্রণে ঃ আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৪৫৭৪১, ৯৩৫৮৪৩২

"KHATI MU'MINER SAHEE JAJBA", by Prof. Ghulam Azam, Published by : Abu Taher Mohammad Ma'sum, Chairman, Publication Department, Bangladesh Jamaate Islami, 504/1 Baro Moghbazar; Dhaka-1217.

Fixed Price : 20.00 (Twenty) taka only.

www.amarboi.org

পটভূমি

মানুষ যে কাজ করার জয্‌বা বা প্রেরণা বোধ করে সে কাজেই সর্বশক্তি প্রয়োগ করে। আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করার হুকুম কুরআনে বারবার দেয়া হয়েছে। এ মহান দায়িত্ব পালন করতে হলে যে সব প্রেরণা প্রয়োজন তা এ পুস্তকে সংকলিত করা হয়েছে।

এ বিষয়টি ১৯৯১ সালের শুরু থেকে কর্মী সম্মেলনে পেশ করে এসেছি। ১৯৯২ সালের মার্চ মাসে কারাগারে আটক হয়ে গেলাম। জেলখানায় বন্দী হয়ে যাওয়ার পর আমি মনে মনে গুমরে মরছিলাম যে, আন্দোলনের প্রধান দায়িত্ব আমার উপর থাকা সত্ত্বেও বিরাট কর্মী বাহিনীকে আমি যা বলতে চাই তা পৌঁছাতে পারছি না। সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমি কারাগারে আটক থাকলেও আমার বক্তব্য লিখিত আকারে বাইরে পাঠিয়ে দেব যাতে কর্মীদের কাছে পৌঁছে যায়। তাহলে আমি কিছুটা সান্ত্বনা পাব। ব্যক্তিগতভাবে হাজির হয়ে নিজের মুখে এ কথাগুলো আল্লাহর পথের মুজাহিদকে শুনাতে পারলে যে তৃপ্তি পেতাম তা থেকে বঞ্চিত থাকলেও অন্ততঃ আমার বক্তব্য তাদের কাছে পৌঁছে যাবে, এ আশায় কলম ধরলাম।

আল্‌হামদুলিল্লাহ, '৯২ এর মে মাসেই আমার লেখাটি তৈরি হয়ে যায়। আমি বন্দিদশায় থাকলেও আমার বক্তব্য মুক্ত ময়দানে পৌঁছে গেল এবং জুলাই মাসেই মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হলো। আমার জেলে থাকা অবস্থায়ই '৯৩ এর মে মাসে এর দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হয়ে গেল।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ইন-শা-আল্লাহ এদেশে আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন একদিন অবশ্যই কায়েম হবে। কিন্তু যে গতিতে সৎলোক তৈরি হচ্ছে তাতে দেরী হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা বোধ করছি। এ বইটি দ্বারা যদি গতি বৃদ্ধিতে সহায়তা হয়, তাহলে আমার শ্রম সার্থক মনে করব। আল্লাহ পাক আমার সে আশা পূরণ করুন-এ দোয়াই করছি। আমীন।

গোলাম আযম

www.amarboi.org

সূচি

○ ইসলামী আন্দোলন ও শয়তানের ষড়যন্ত্র ০৫

○ **সহীহ্ জয্বা** ০৬
* মুমিনের ৬টি জয্বা ০৭

১. **আল্লাহর প্রতি শুকরিয়ার জয্বা** ০৭
* আসল শুকরিয়া ১০
* আনসারুল্লাহ ১১

২. **সহীহ্ নিয়্যতের জয্বা** ১৪
* আল্লাহর সন্তুষ্টির গুরুত্ব ১৫

৩. **বেহেশতে যাওয়ার জয্বা** ১৬
* বাইয়াত ১৭
* সংগঠনের গুরুত্ব ১৭

৪. **আল্লাহর গোলাম হওয়ার জয্বা** ১৮
* ইবাদুল্লাহ ১৯
* আওলিয়া উল্লাহ ২০
* আল্লাহর ওয়ালীর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ২১

৫. **আল্লাহর খলীফা হওয়ার জযবা** ২৪
* খুলাফাউল্লাহ ২৪
* খিলাফতের দায়িত্ব ২৬
* মানুষের জন্যই পৃথিবীর সৃষ্টি ২৭
* মানুষ শুধু খলীফা ২৮

৬. **আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার জয্বা** ২৯
* শাহাদাতের জয্বা ২৯
* শাহাদাতের কামনা ৩১

○ **এক নজরে ৬টি জয্বা** ৩২

○ ইসলামী আন্দোলন পূর্ণ ইসলাম চায় ৩৩

○ সৎলোক কি আর কোথাও তৈরী হয়না? ৩৪

○ ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য বিশেষ পরামর্শ ৩৭

www.amarboi.org

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ইসলামী আন্দোলন ও শয়তানের ষড়যন্ত্র

আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীনকে কায়েম করার উদ্দেশ্যে যারা সংগঠনে যোগদান করে এবং সংগঠনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে, তাদের উপরই শয়তান সবচেয়ে বেশি ক্ষিপ্ত। কারণ শয়তানের রাজত্বের ক্ষতি করার যোগ্যতা তাদেরই। তারা আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েম করতে চেষ্টা করে। যদি তারা সফল হয়, তাহলে শয়তানের রাজত্ব টিকতে পারে না।

অবশ্য শয়তান সব ঈমানদারকেই গুমরাহ করার চেষ্টা করে এবং তাদেরকে নেক আমল থেকে ফিরিয়ে রাখার সব রকম তদবীর চালায়। কিন্তু শুধু ঈমান ও আনুষ্ঠানিক আমলের দ্বারা শয়তানের রাজত্বের তেমন কোন ক্ষতি হয় না। শয়তানের শাসন ব্যবস্থার অধীনে যে সব ঈমানদার ও সৎলোক বাস করে, তাদের উপর শয়তান অসন্তুষ্ট হলেও ক্ষিপ্ত হয় না। কারণ তারা শয়তানের রাজ্যের বিদ্রোহী নয়।

ইসলামী আন্দোলনের প্রতিটি কর্মীকে শয়তান বিদ্রোহী ও চরম দুশমন মনে করে। তাই হাজারো ফন্দি-ফিকির ও ষড়যন্ত্র করে কর্মীদেরকে এ পথ থেকে সরানোর চেষ্টা করে। যদি সরাতে না পারে, তাহলে কর্মীদের নিয়্যতে ভেজাল মিশানোর চেষ্টা করে এবং কর্মীদের মধ্যে বিভেদ ও ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালায়। আর মানুষের মধ্যে যারা শয়তানের খলীফা, চেলা ও শাগরিদ তারাও দুনিয়ার লোভ দেখিয়ে বা বাতিল শক্তির ভয় দেখিয়ে কর্মীদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে।

তাই শয়তান ও শয়তানের শাগরিদদের চালাকী, ধোঁকা, ষড়যন্ত্র ও চক্কর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অত্যন্ত সতর্ক থাকা দরকার। আল্লাহ্ পাক বলেন-

www.amarboi.org

إِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ـ

'শয়তান তোমাদের দুশমন, তাকে দুশমনই মনে করবে।'

(সূরা ফাতির ৬ আয়াত)

আদম (আ.) শয়তানকে যদি দুশমন মনে করতেন তাহলে ধোঁকায় পড়তেন না। শয়তান অতি শুভাকাঙ্ক্ষী সেজে যে পরামর্শ দিল তা তিনি কবুল করতেন না যদি বুঝতেন যে, সে দুশমন। দুশমনের পরামর্শ কোন অবস্থায়ই গ্রহণ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাই আল্লাহর কথা অমান্য করা ও আল্লাহর পথে জিহাদ করা থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য যে যত 'মিষ্ট পরামর্শ' ও 'সুবুদ্ধিই' দিক, তা যে শয়তানের ধোঁকা সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে আল্লাহর পথে মজবুত হয়ে টিকে থাকতে হলে সচেতনভাবে সব সময় ও সব অবস্থায় মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর পথে আসতে পারা বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়। এ পথে আসার উদ্দেশ্যে বা নিয়্যতে যেন কোন ভেজাল না থাকে, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। ইসলামী আন্দোলনে আসার পর আল্লাহ তা'য়ালা জান ও মালের কী ধরনের কুরবানী দাবী করেন তা বুঝতে হবে। এ পথে চলার ফলে কোন্ কোন্ যোগ্যতা ও গুণ অর্জন করতে হবে, সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে।

সহীহ্ জয্‌বা

সহীহ্ صَحِيْحٌ আরবী শব্দ। এর অর্থ সঠিক, বিশুদ্ধ, যথাযথ। জয্‌বা শব্দটি আরবী جَذْبٌ থেকে এসেছে। জয্‌ব্ অর্থ আকর্ষণীয়, যা টেনে নেয়।

জয্‌বা মানে আবেগ, ভাবাবেগ, ঐশী আবেগ, অনুভূতি, কর্ম প্রেরণা ইত্যাদি।

মানুষের সকল কর্ম চাঞ্চল্য, তৎপরতা ও ব্যস্ততার চালিকা শক্তিই হলো জয্‌বা। মানুষ যখন কোন লক্ষ্য হাসিল করার উদ্দেশ্যে আবেগ-তাড়িত হয় তখনই সে কর্ম চঞ্চল হয় এবং ঐ লক্ষ্য হাসিল করার জন্য তার দেহ, মন, মেধা, সময়, অর্থ, চিন্তাধান্দা সবই কাজে লাগায়। তার জয্‌বা তাকে লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য সকল রকম বাধা-অতিক্রম করা, দুঃখ কষ্ট সহ্য করা ও আরাম-আয়েশ ত্যাগ করার সাহস এবং যোগ্যতার যোগান দেয়।

এ জয্‌বা যদি সহীহ্ হয় তাহলে সে যা করে তার সুফল সে ভোগ করে। আর জয্‌বা যদি গলদ (ভুল) হয় তাহলে এর কুফলও অনিবার্য।

www.amarboi.org

যে সব 'সহীহ্ জয্বা' থাকলে একজন মুমিনের ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে দুনিয়া ও আখিরাতে পূর্ণ সাফল্য লাভের আশা করা যায় তা কুরআনের পরিভাষাসহ এ পুস্তিকায় পেশ করা হলো।

মোট ৬টি জয্বা এখানে আলোচনা করা হচ্ছে। যারা সচেতনভাবে এ কয়টি জয্বার লালন করবে তারা ইনশাআল্লাহ্ শয়তানের দুশমনী, নাফসের ধোঁকা, পরিবেশের চাপ ও যাবতীয় বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও আল্লাহর পথে মযবুত হয়ে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে।

মুমিনের ৬টি জয্বা

১. আল্লাহর প্রতি শুকরিয়ার জয্বা।
২. সহীহ্ নিয়তের জয্বা।
৩. বেহেশতে যাওয়ার জয্বা।
৪. আল্লাহর গোলাম হওয়ার জয্বা।
৫. আল্লাহর খলীফা হওয়ার জয্বা।
৬. আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার জয্বা।

১. আল্লাহর প্রতি শুকরিয়ার জয্বা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

'আলহামদুলিল্লাহ'-এটি আল্লাহ তায়ালার প্রতি শুকরিয়া জানাবার সবচেয়ে সুন্দর ভাষা। আল্লাহ পাক নিজেই তা শিক্ষা দিয়েছেন। এর অর্থ হলো 'সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।' রাসূল (সা.) বলেছেন-

اَلْحَمْدُ رَأْسُ الشُّكْرِ -مَاشَكَرَ اللّٰهَ عَبْدٌ لَايَحْمَدُهُ ـ (المشكوة)

'আলহামদু হলো শুকরিয়ার মাথা (প্রধান শুকরিয়া)। যে বান্দাহ আল্লাহর প্রশংসা করল না সে আল্লাহর প্রতি শুকরিয়াও জানাল না।' *(মেশকাত)*

আল্লাহ তায়ালা আমাদের দেহের মধ্যেই অগণিত নিয়ামত দান করেছেন। আর সৃষ্টি জগতে যে কত নিয়ামত দিয়েছেন তা গুনে শেষ করা যাবে না বলে কুরআনে বারবার ঘোষণা করা হয়েছে।

কিন্তু একটি নিয়ামত এমন রয়েছে যার কোন তুলনা নেই। আর সব নিয়ামত একত্র করলেও ঐ একটি নিয়ামতের সমান হতে পারে না। সে মহা নিয়ামতটি

www.amarboi.org

হলো দ্বীন ও ঈমান। দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তির একমাত্র উপায়ই হলো এ নিয়ামত।

কুরআন মজিদের একটি সূরার নাম 'আর রাহমান'। রাহমান অর্থ মেহেরবান, দয়ালু, করুণাময়। এর সাথে আলিফ ও লাম যুক্ত হয়ে আররাহমান শব্দ হয়েছে। এর অর্থ হলো সকল দয়া ও করুণার আধার ও উৎস। এ সূরার শুরুতেই বলা হয়েছে

الرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ -

অর্থাৎ তিনিই আররাহমান যিনি কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। কুরআনেই ইসলামের নীল নকশা দেওয়া হয়েছে, যার ভিত্তিতে রাসূল (সা.) ইসলামের পূর্ণ রূপ বাস্তবে কায়েম করেছেন। এ আয়াতটি থেকে একথাই প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহর সবচেয়ে বড়ো নিয়ামতই ইসলাম। ইসলামের চেয়ে বড় দয়ার দান আর কিছুই নয়। সুতরাং আমরা যারা ইসলামী আন্দোলনে যোগদান করার সৌভাগ্য লাভ করেছি তাদের পয়লা কর্তব্যই হলো এর জন্য মেহেরবান মাবুদের প্রতি শুকরিয়া জানানো।

এ আন্দোলনে আসার আগে আমরা ইসলামকে শুধু একটি ধর্মই মনে করতাম। জীবনের সব ক্ষেত্রে আল্লাহকে একমাত্র মনিব মেনে তার হুকুম পালন করতে হবে এবং তার রাসূলকে একমাত্র নেতা মেনে শুধু তার তরীকা মতো চলতে হবে-এমন কথা আগে জানা ছিল না। ঈমান, ইসলাম, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ও জিহাদের হাকীকত জানতাম না। এসবকে শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান বলেই মনে করতাম।

ইসলামী রাষ্ট্র, ইসলামী সরকার, ইসলামী আইন কায়েম করার চেষ্টা করা ঈমানদারদের সবচেয়ে বড়ো ফরয, এ উদ্দেশ্যে ইসলামী সংগঠনভুক্ত হয়ে কাজ করাও ফরয এবং কুরআনের আইন শুধু তিলাওয়াতের জন্য নয়, আল্লাহর আইন মানুষের তৈরি আইনের অধীনে থাকার জন্য আসেনি, ইসলামকে বিজয়ী করার দায়িত্ব দিয়েই রাসূল (সা.) কে পাঠানো হয়েছে- এ সব বিপ্লবী কথা এ আন্দোলনের বাইরে আলেম সমাজ থেকে কোনদিন শুনিনি।

ইসলামী আন্দোলনে এসে ইসলামকে আল্লাহর দেয়া পূর্ণাঙ্গ একমাত্র জীবন বিধান হিসেবে জেনে ঈমানের যে স্বাদ পেলাম এর জন্য শুকরিয়া আদায় করে কি শেষ করা যাবে? তাই প্রাণভরে আজীবন আল হামদুলিল্লাহর তাসবীহ জপতে থাকব।

www.amarboi.org

আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানী না হলে কেউ হিদায়াত পায় না। তিনি হিদায়াতের তাওফীক দিলেই দীনের পথে চলা সম্ভব হয়। একথা হামেশা মনে থাকলে আল্লাহর প্রতি শুকরিয়ার জয্বা তাজা থাকে। হিদায়াত পাওয়ার জন্য শুকরিয়ার এ জয্বা দুনিয়ায়ই শেষ হয়ে যাবে না। বেহেশতেও শুকরিয়ার এ জয্বা জারী থাকবে বলে কুরআন পাকে উল্লেখ রয়েছে।

وَقَالُوْا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَآ اَنْ هَدٰنَا اللّٰهُ ـ

'বেহেশতবাসীরা বলবে, ঐ আল্লাহরই সকল প্রশংসা যিনি এ পথে আমাদেরকে হিদায়াত করেছেন। আল্লাহ যদি হিদায়াত না করতেন, তাহলে আমরা কখনও হিদায়াত পেতাম না।' *(সূরা আল আরাফ-৪৩ আয়াত)*

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল যে, বেহেশতের নিয়ামত পেয়ে বেহেশতবাসীরা নিজেদের বাহাদুরী প্রকাশ করে বলবে না যে, আমরা নেক আমল করার কারণেই আজ এ নিয়ামতের ভাগী হয়েছি। বরং এ নিয়ামতের কৃতিত্ব যে আল্লাহর সে কথাই তারা স্বীকার করবে। তাই হিদায়াত পাওয়ার জন্য শুকরিয়া স্বরূপ আলহামদুলিল্লাহ জপতে থাকাই উচিত। শুকরিয়ার গভীর ও আন্তরিক অনুভূতি নিয়ে নামাযের পর এ তাসবীহ তৃপ্তির সাথে উচ্চারণ করলে মনের শান্তি আরও বেড়ে যাবে।

সব সময় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার জন্য রাসূল (সা.) এমন সব দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন যা 'আলহামদুলিল্লাহ' দিয়ে শুরু করা হয়েছে।

যেমন ঃ

ঘুম থেকে জেগে-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ ـ

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি মৃত্যুর পর আমাদের জীবিত করেছেন। আর তাঁর দিকেই আমরা ফিরে যাবো।"

পায়খানা পেশাবের পর-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّى الاَذٰى وَعَافَانِىْ ـ

'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার যিনি তাকলীফ দূর করেছেন এবং মুক্তি দিয়েছেন।'

www.amarboi.org

খাওয়ার পর-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ -

'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার যিনি আমাদের পানাহার করিয়েছেন এবং মুসলমানদের মধ্যে শামিল করেছেন।'

যানবাহনে উঠে-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ - سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ -

অর্থ- "সব প্রশংসা আল্লাহর, পবিত্রতা বর্ণনা করছি সেই সত্তার, যিনি আমাদের জন্য এটিকে অনুগত করে দিয়েছেন। আমরা এর উপর ক্ষমতাবান ছিলাম না এবং নিশ্চয়ই আমরা আমাদের 'রব' এর নিকট প্রত্যাবর্তন করব।"

আসল শুকরিয়া

আগেই বলা হয়েছে যে দ্বীন ও ঈমানই হচ্ছে সেরা নিয়ামত যার শুকরিয়া বেহেশতবাসী হওয়ার পরও আদায় করতে হবে। এ মহা নিয়ামতের শুকরিয়া শুধু মুখে 'আলহামদুলিল্লাহ' জপলেই আদায় হতে পারে না। এর আসল শুকরিয়া হলো আমলী শুকরিয়া বা বাস্তব শুকরিয়া। এ শুকরিয়া কিভাবে জানানো যায়?

আমি কীভাবে ইকামতে দ্বীন বা ইসলামী আন্দোলনের এ মহান পথের সন্ধান পেলাম? আমার নিকট কোন ফেরেশতা এসে দ্বীন ও ঈমানের এ পথ দেখায়নি। ইসলামী আন্দোলনের এক কর্মী আমাকে দাওয়াত দিয়েছেন, আমাকে টার্গেট বানিয়ে আমার পেছনে খেটেছেন। তার মাধ্যমেই আমি এ পথ পেয়েছি।

রাসূল (সা.) হুকুম দিয়েছেন- 'আমার কাছ থেকে যদি একটি আয়াতও শিখে থাক তাহলে অন্যকে তা পৌঁছাও।' ঈমান আনার পর পয়লা কর্তব্যই হলো অন্যকে ঈমান আনার দাওয়াত দেয়া।

আমার পরিবার পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব যাদের সুখে আমি সুখী এবং যাদের দুঃখে আমি দুঃখী- তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ কামনা

www.amarboi.org

করাই কি আমার কর্তব্য নয়? তাদেরকে কি ফেরেশতা এসে দ্বীনের দাওয়াত দেবে?

ইসলামী আন্দোলনের কর্মী হিসেবে আমি যদি আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েমের চেষ্টা করা কর্তব্য মনে করি তাহলে অন্যান্য সকলের নিকট দ্বীনের দাওয়াত পৌছানোর ধান্দা আমার থাকতেই হবে।

দাওয়াতে দ্বীনের এ কাজই আসল শুকরিয়া, বাস্তব শুকরিয়া বা আমলী শুকরিয়া। যে এ কাজ ইখলাসের সাথে করে আল্লাহ্ পাক তাকে 'আনসারুল্লাহ্' হিসেবে মর্যাদা দান করেন।

আনসারুল্লাহ . اَنْصَارُ اللّٰهِ

আনসার শব্দটি নাসির শব্দের বহুবচন। নাসির মানে সাহায্যকারী। আনসারুল্লাহ্ মানে আল্লাহর সাহায্যকারীগণ। আল্লাহকে সাহায্য করা সম্পর্কে কুরআন শরীফে বহু আয়াত রয়েছে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَنْصُرُوْا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ ـ

'হে ঐ সব লোক যারা ঈমান এনেছ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, তাহলে আল্লাহও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন।' *(সূরা মুহাম্মদ ৭ আয়াত)*

وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ـ

'আল্লাহ জেনে নিতে চান কে না দেখেও আল্লাহ ও তার রাসূলগণকে সাহায্য করে।' *(সূরা আল হাদীদ-২৫ আয়াত)*

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا كُوْنُوْٓا اَنْصَارَ اللّٰهِ ـ

'হে ঐ সব লোক যারা ঈমান এনেছ, তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হও।'
(সূরা আস্সাফ-১৪ আয়াত)

এসব আয়াতে আল্লাহকে সাহায্য করার যে তাকীদ রয়েছে এর আসল মর্ম কী? আল্লাহ কি মানুষের সাহায্যের কাঙ্গাল? অসহায় মানুষ সব সময়ই আল্লাহর সাহায্যের ভিখারী। এ অবস্থায় আল্লাহ মানুষের কাছে সাহায্য চাওয়ার অর্থ কী? এটা বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ।

www.amarboi.org

আল্লাহর কোন মু'মিন বান্দাহর চেষ্টায় যখন কোন গুমরাহ্ লোক হিদায়াতের পথ পায়, তখন আল্লাহ কেমন খুশি হন সে কথা বুঝানোর জন্য রাসূল (সা.) এক চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন। এক লোক বিশ্রাম নেয়ার জন্য সফর মুলতবী করে এক গাছের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়ল। জেগে দেখে তার উটটি নেই। উটের পিঠেই খাবার ও পানীয় রয়েছে। পেরেশান হয়ে তালাশ করে কোথাও না পেয়ে সে চরম হতাশ অবস্থায় অবসন্ন হয়ে মৃত্যু নিশ্চিত মনে করে চোখ বুজে পড়ে রইল। একটু পরে চোখ মেলে দেখে যে তার উট হাযির। খুশির চোটে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে গিয়ে সে যা বলতে চেয়েছে তা বে-খেয়ালে উল্টা বলে ফেলেছে। 'হে আল্লাহ্, আমি তোমার মনিব আর তুমি আমার দাস।' এ লোক হারানো উট পেয়ে যেমন খুশি হয়েছে, তেমনি আল্লাহর কোন গুমরাহ (পথহারা) বান্দাহ্ হিদায়াত হলে তিনি এর চেয়েও বেশি খুশি হন।

আল্লাহর গুমরাহ্ বান্দাহদেরকে হিদায়াত করার চেষ্টা করা যে কত বড় ফযীলতের কাজ সে কথা বুঝানোর জন্যই রাসূল (সা.) এমন সুন্দর উদাহরণটি দিলেন। অথচ মানুষকে হিদায়াত করার কোন ক্ষমতা নবীদেরকেও দেয়া হয়নি। রাসূল (সা.) এর চাচা আবূ তালিব পিতার স্নেহ দিয়ে তাকে লালন-পালন করায় এবং নবুয়তের কঠিন সংগ্রামী জীবনে বিরোধীদের মুকাবিলায় মযবুত ঢালের ভূমিকা পালন করায় এ চাচার প্রতি তার গভীর মহব্বত থাকাই স্বাভাবিক। চাচার মৃত্যুকালে তিনি চেষ্টা করলেন যে, তার প্রিয় মুরুব্বী ঈমান নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় হতে পারেন। কিন্তু রাসূল (সা.)-এর আশা পূরণ হলো না। আল্লাহ্ তায়ালা সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,

إِنَّكَ لَاتَهْدِيْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ –

'হে রাসূল আপনি কাউকে মহব্বত করেন বলেই তাকে হিদায়াত করতে পারবেন না। আল্লাহ্ যাকে চান তাকেই হিদায়াতের তাওফীক দেন।'

(সূরা আল কাসাস, ৫৬ আয়াত)

এ দ্বারা প্রমাণ হয় যে, মানুষের হিদায়াতের পূর্ণ ইখতিয়ার আল্লাহ তায়ালার হাতে। হিদায়াত দান করা একমাত্র আল্লাহর কাজ। এ ব্যাপারে নবীর হাতেও ক্ষমতা দেয়া হয়নি। অথচ মানুষের হিদায়াতের জন্যই নবী পাঠান হয়েছে এবং নবীর প্রতি যারা ঈমান আনে তাদের উপরও এ কর্তব্য রয়েছে যেন তারা অন্যদের হিদায়াত পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে। এখানেও প্রশ্ন উঠতে পারে যে,

www.amarboi.org

হিদায়াত করার ক্ষমতা যাদের হাতে দেয়া হয়নি, তাদেরকে চেষ্টা করার দায়িত্ব কেন দেয়া হলো?

এর জওয়াব এই যে, আল্লাহ তায়ালা হিদায়াত কবুল করা বা না করার ব্যাপারে মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছেন। কেউ ইচ্ছা করলে হিদায়াত কবুল করতে পারে। আল্লাহ্ ঈমান আনার জন্য যেমন কাউকে বাধ্য করেন না, তেমনি গুমরা থাকার জন্যও বাধ্য করেন না। কিন্তু যারা হিদায়াত পেতে চায়, তাদেরকে হিদায়াতের পথ দেখানোর ব্যবস্থা তো থাকা দরকার। সে ব্যবস্থাটাই হলো এই যে, তিনি নবী পাঠান হিদায়াতের উপায় দেখানোর জন্য। যারা হিদায়াত কবুল করে, তাদের উপর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে যে, তারাও যেন নবীদের মতোই অন্য মানুষের হিদায়াত পাওয়ার চেষ্টা করে। এই যে, পথ দেখানোর কাজটা এটা না হলে যারা হিদায়াত কবুল করতে চায়, তারা কেমন করে ঈমান আনবে। হিদায়াতের আসল মালিক যে আল্লাহ্ সে বিষয়ে তো কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আল্লাহ তো নিজে আসমান থেকে ওয়ায করার ব্যবস্থা করেননি। তিনি তো নিজে এসে মানুষকে বুঝানোর নিয়ম বানাননি। তাহলে মানুষের হিদায়াত পাওয়ার উপায় কি? দাওয়াত ইলাল্লাহই সে উপায়।

তাহলে এ কথা প্রমাণ হলো যে মানুষকে আল্লাহই হিদায়াতের তাওফীক দেন। কে হিদায়াতের যোগ্য তার ফায়সালা তিনিই করেন। কিন্তু এ ফায়সালা করার জন্য দায়ী ইলাল্লাহর দায়িত্ব যারা পালন করেন, তাদের অবদানকে কোনক্রমেই স্বীকার না করে পারা যায় না। তাই আল্লাহ্ পাক তাদেরকে 'আনসারুল্লাহ্' উপাধি দিয়ে তাদের খেদমতের স্বীকৃতি দিলেন। কারণ তারা আল্লাহর হেদায়াত করার দায়িত্ব পালনে সহায়তা করল।

কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে, 'আনসারুল্লাহ্' পদবীটা দয়াময় আল্লাহ্র দেয়া সম্মান। আমরা দাওয়াতী কাজ করি বলে নিজেদেরকে আনসারুল্লাহ্ বলে দাবী যেন না করি। ফরয কাজ মনে করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি পাওয়ার নিয়তেই আমাদেরকে এ কাজ করতে হবে। যেহেতু মূলত কাজটা আল্লাহর, সেহেতু তিনি দয়া করে আনসারুল্লাহ্ উপাধি দিয়েছেন।

আরও একটা কাজ এমন আছে যা আমরা কর্তব্য হিসেবেই করি। কিন্তু আল্লাহ্ পাক সে কাজের জন্য এমন এক সম্মানজনক নাম দিয়েছেন যা দ্বারা তার পরম সন্তুষ্টিরই প্রকাশ হয়েছে। সে কাজটি হলো আল্লাহর পথে খরচ করা। এটা আমাদের উপর ফরয। আমরা আল্লাহর হুকুম পালন করি তাঁর সন্তুষ্টি

www.amarboi.org

পাওয়ার আশায়। কিন্তু তিনি মেহেরবানী করে আমাদের এ কাজকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য বলেন যে, আমার বান্দাহ আমাকে করয দিল।

مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا

'এমন কে আছে যে আল্লাহকে করযে হাসানা দেবে?'

(সূরা আল বাকারাহ ২৪৫ ও সূরা আল হাদীদ ১১ আয়াত)

আল্লাহর পথে দান করাকে তিনি এ জন্য করয বলেন যে, তিনি এর বদলা দেবেন এবং যা দান করা হয়েছে তার চেয়ে বহুগুণ বাড়িয়ে দেবেন। অর্থাৎ তিনি ফেরত দেবেন বলেই দানকে করয গণ্য করেন। আমরা তাঁরই দেয়া মাল দান করি। অথচ তিনি এটাকে করয হিসেবে মর্যাদা দেন।

আমরা কি আল্লাহকে ধার দিচ্ছি বলে মনে করে দান করি? তা কখনো নয়। তেমনি আমরা আল্লাহকে সাহায্য করছি মনে করে দাওয়াতী কাজ করি না। কিন্তু এ কাজ যারা করে তাদেরকে তিনি আদর করে আনসারুল্লাহর মর্যাদা দান করেন।

২. সহীহ্ নিয়্যতের জয্‌বা رِضْوَانُ اللّٰهِ

যত বড় নেক আমলই করা হোক, সহী নিয়্যতে করা না হলে আল্লাহ্ পাক তা কবুল করেন না। বোখারী শরীফ ও মিশকাত শরীফে নিয়্যত সম্পর্কে রাসূল (সা.) এর হাদীসটি সর্বপ্রথম উল্লেখ করেছেন। কে কী নিয়্যতে কাজ করেছে সেটা বিচার করেই আল্লাহ মানুষের আমলের বদলা দেবেন। নিয়্যত সহীহ না হলে কোন ভাল কাজেরও পুরস্কার পাওয়া যাবে না। আল্লাহর রাসূল (সা.) স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ–

'নিশ্চয়ই সব আমল নিয়্যতের দ্বারা বিচার্য।'

তাই ইসলামী আন্দোলনের প্রত্যেক কর্মীকে নিজের দিলের হিসাব নিতে হবে যে আমি কী নিয়্যতে বা কোন উদ্দেশ্যে এ পথে এসেছি। আমি কি নিজের কোন স্বার্থ হাসিল করার জন্য আন্দোলনে এসেছি? দুনিয়ার কোন লাভের আশায় কি এ সংগঠনে যোগ দিয়েছি? যদি এমন কোন স্বার্থ বা লোভ মনে থাকে, তাহলে তা সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে হবে। কারণ এ ভুল নিয়্যত নিয়ে এখানে বেশি দিন টিকতে পারবে না। এক সময় ছাঁটাই হয়ে পড়তে হবে। যে

www.amarboi.org

নিয়্যতে মানুষ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে যোগদান করে ঐ নিয়্যতে ইসলামী আন্দোলনের সংগঠনে শামিল হওয়া বোকামী।

হাদীস থেকে জানা যায় যে, আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে নিহত হওয়া সত্ত্বেও সহীহ্ নিয়্যতের অভাবে দোযখে যেতে হবে। হাশরের ময়দানে এমন এক নিহত লোককে আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, 'তুমি কী আমল নিয়ে এসেছ?' সে জওয়াবে বলবে, 'আমি দ্বীনের বিজয়ের জন্য যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছি।' আল্লাহ বলবেন, 'তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি এ নিয়্যতে যুদ্ধ করেছ যে, লোকেরা তোমাকে বীর ও বাহাদুর বলবে। তোমার এ নিয়্যতের বদলা পেয়েছ। আমার কাছে পাওয়ার নিয়্যত তুমি করনি। তাই দোযখই তোমার প্রাপ্য।'

এর চেয়ে বড় কোন উদাহরণ হতে পারে না। শহীদ হয়েও শুধু সহীহ্ নিয়্যতের অভাবে দোযখে যেতে হবে। একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতে পুরস্কারের নিয়্যতে কাজ করলেই সুফলের আশা করা যায়।

আল্লাহর সন্তুষ্টির গুরুত্ব

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের দরকার কী? যারা দুনিয়ার জীবনের সুখ-সুবিধাকেই আসল পাওয়ার জিনিস মনে করে তাদের নিকট আল্লাহর সন্তুষ্টির গুরুত্ব নেই। কিন্তু যারা আখিরাতের অনন্ত অসীম জীবনে সুখ-শান্তির জন্য পেরেশান, তাদের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অত্যন্ত জরুরী।

আমরা যারা কবরের আযাব, ময়দানে হাশরের হয়রানি ও দোযখের কঠিন শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে চাই এবং বেহেশতের সুখ ভোগ করতে আগ্রহী, তাদের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টির ঠেকা বড় জবর ঠেকা। কারণ আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া ঐ সবের কোনটাই পাওয়ার আশা করা যায় না।

কুরআন ও হাদীস এবং রাসূল (সা.) ও সাহাবায়ে কেরামের (রা.) জীবন এ কথাই প্রমাণ করে যে, আল্লাহর যমীনে মানুষের মনগড়া আইন চালু থাকা অবস্থায় শুধু নামায রোযা দ্বারাই আল্লাহ সন্তুষ্ট হন না। আল্লাহর আইন চালু করার সংগ্রাম করতে গিয়ে বাতিলের সাথে আপোস করা ঈমানের বিরোধী। রাসূল (সা.) এর যুগে যারা নামায রোযা করতো কিন্তু বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াই এড়িয়ে চলতো, তাদেরকে মুনাফিক বলা হয়েছে। তাই আমাদের ঈমানের তাকীদেই আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্যে ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলনে সক্রিয় থাকতে হবে।

www.amarboi.org

সূরা আলে ইমরানের ১৭৩ ও ১৭৪ আয়াতে বলা হয়েছে যে, একদল মুসলমানের ভুলের কারণে উহুদ যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পরপরই রাসূল (সা.) যখন আবার দুশমনদের উপর হামলা করার জন্য মুসলিম বাহিনীকে ডাক দিলেন, তখন মুনাফিকরা তাদেরকে এই বলে ভীত করার চেষ্টা করল যে, দুশমনদের বিরাট বাহিনীর সমাবেশ হয়েছে। এ কথা শুনার পর মুজাহিদরা ভীত হওয়ার পরিবর্তে তাদের ঈমান আরও বেড়ে গেল এবং তারা এই বলে জিহাদের ময়দানে এগিয়ে গেল যে, حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

(আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ অভিভাবক)। ফলে তারা সে যুদ্ধে আর কোনো ক্ষতি হওয়া থেকে বেঁচে গেলেন, আল্লাহ্র নিয়ামত ও অনুগ্রহ নিয়ে নিরাপদে ফিরে এলেন এবং وَاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ

(তারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির পথে চলার গৌরবও লাভ করলেন)।

এভাবেই দেখা যায় যে, যারা নিষ্ঠার সাথে একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিজেদের জান-মাল আল্লাহ্র পথে কুরবান করে, তাদেরকে তিনি বিজয়ী করেন এবং তাঁর সন্তুষ্টির পথে চলার তাওফীক দান করেন।

'আল্লাহ্র সন্তুষ্টি' কথাটি কুরআনের পরিভাষায় 'রিদওয়ানুল্লাহ্'। রাযী হওয়া মানে সন্তুষ্ট হওয়া। আর সন্তুষ্টির আরবী হলো 'রিযওয়ান' বা 'রিদওয়ান' رِضْوَانٌ

৩. বেহেশতে যাওয়ার জয্বা بَيْعَةٌ بِاللّٰهِ

যারা আখিরাতে বিশ্বাসী তারা কেউ দোযখে যেতে চায় না। সবাই বেহেশতে যাওয়ার কামনা করে। কিন্তু বেহেশতে যাওয়ার জন্য যা করা জরুরী তা করার গুরুত্ব সবাই অনুভব করে না। অনেকে মনে করে যে আল্লাহ্ দয়াবান, মরার আগে তাওবা করলেই চলবে।

যারা কলেজে ভর্তি হয় তারা কেউ ফেল করার নিয়্যত করে না। পাশের আশা নিয়েই ভর্তি হয়। কিন্তু পাশ করতে হলে যা যা করা দরকার তা না করার ফলেই এত ছাত্র ফেল করে। তাই বেহেশতে যাওয়ার কামনা থাকলেই চলবে না, এর জন্য যা করণীয় তা অবশ্যই করতে হবে।

www.amarboi.org

বেহেশতের মালিক আল্লাহ তায়ালা। তিনি ঘোষণা করেছেন যে যারা তাদের জান ও মাল আল্লাহর নিকট বিক্রয় করবে তারাই এর বিনিময়ে দাম হিসেবে বেহেশত পাবে। এটাই কুরআনের পরিভাষায় বাইয়াত بَيْعَةٌ

বাইয়াত بَيْعَةٌ

বাইয়াত মানে বিক্রয়। বাইয়াত বিল্লাহ অর্থ আল্লাহর কাছে বিক্রয়। ইসলামী আন্দোলনে নিয়্যত ঠিক রেখে নিঃস্বার্থভাবে দায়িত্ব পালন করতে হলে আমাদের জান ও মাল আল্লাহর মরযী মতো ব্যবহার করতে হবে। জান ও মাল আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে খরচ করার জন্য আমাদেরকে উৎসাহ দেওয়ার উদ্দেশ্যেই সূরা আত তাওবার ১১১ নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ـ

'নিশ্চয় আল্লাহ জান্নাতের বিনিময়ে মু'মিনদের কাছ থেকে তাদের জান ও মাল কিনে নিয়েছেন।'

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল যে, বেহেশত পেতে হলে আমার জান ও মাল আল্লাহর কাছে বিক্রয় করতে হবে। অর্থাৎ আমার জান ও মালের কর্তা আমি নই, আল্লাহ। এ কথা মনে করে আমাকে চলতে হবে। আমার নফসের মরযী মতো জান ও মাল ব্যবহার করলে বেহেশত পাওয়ার কোন আশা নেই।

জয্‌বা ও আবেগ নিয়ে জান-মাল আল্লাহর কাছে বিক্রয় করেছি বলে যতই আমরা মনে করি বাস্তবে আল্লাহর মরযী মতো জান, মাল কাজে লাগানো সহজ নয়। কারণ নফস ধোঁকা দেয়। পরিবার ও আত্মীয়-স্বজন চাপ দেয় আর শয়তান কুমন্ত্রণা দেয়। ফলে আল্লাহর মরযী মতো চলা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

সংগঠনের গুরুত্ব

আল্লাহর নিকট জান ও মাল বিক্রয় করার পর বাইয়তের দাবী পূরণের প্রয়োজনেই ইসলামী আন্দোলনের কোন সংগঠনভুক্ত হওয়া জরুরী। এ জন্যই রাসূল (সা.) অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে জামায়াতবদ্ধ হওয়ার হুকুম দিয়েছেন। তিনি বলেন- 'আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ে হুকুম দিচ্ছি। আল্লাহও আমাকে এ কয়টির আদেশ করেছেন। জামায়াত, (জামায়াতের) নির্দেশ শোনা, (সে নির্দেশ) মেনে চলা। হিজরত করা ও জিহাদ করা।'

www.amarboi.org

তাই ইসলামী আন্দোলন করা যেমন ফরয তেমনি আন্দোলনের প্রয়োজনেই সংগঠনভুক্ত হওয়াও ফরয। একা নবীর পক্ষেও ইসলামকে বিজয়ী করা সম্ভব নয় বলেই আল্লাহ্ পাক নবীকেও জামায়াত কায়েমের নির্দেশ দিয়েছেন।

আমি যখন জামায়াতের রুকন হলাম তখন সাংগঠনিক নিয়মেই দ্বীনের কাজে চমৎকার কর্মসূচীতে শরীক হওয়ার সুযোগ পেয়ে গেলাম। ফলে আর দশজনের সাথে মিলে আমার জান ও মাল আল্লাহর মরযী মতো কাজে লাগানো সহজ হয়ে গেল। নাফসের দুর্বলতা, শয়তানের ধোঁকা, আত্মীয়-স্বজনের চাপ ও পরিবেশের বাধা অতিক্রম করতে সংগঠন সত্যি কার্যকর ভূমিকা পালন করে। আমার রিপোর্ট মানে আছে কি না তা দেখার জন্য সংগঠনের দায়িত্বশীল লক্ষ্য রাখেন।

আমি কোন কারণে কাজে ঢিল দিলে দ্বীনের পথের সাথীরা আমাকে আবার চাঙ্গা করে তোলে। আমার চলার পথে কোন সমস্যা হলে এর সমাধানে সংগঠন এগিয়ে আসে। এভাবেই আল্লাহর নিকট জান ও মাল বিক্রয়ের (বাইয়াতের) দাবী পূরণ করা সহজ হয়।

৪. আল্লাহর গোলাম হওয়ার জয্বা عِبَادُ اللّٰهِ

নফসের গোলামী, শয়তানের প্রতারণা ও আল্লাহ ছাড়া আর সব শক্তির দাপটকে অগ্রাহ্য করার হিম্মত তারই আছে যার মধ্যে একমাত্র আল্লাহর গোলাম হওয়ার জয্বা প্রবল।

একমাত্র আল্লাহর দাস হিসেবে জীবন যাপনের সিদ্ধান্ত যারা নেয় তারাই জীবন সাগরে চলার পথের বাধাকে জয় করতে পারে। যে নৌকা একটি মাত্র হালের অধীনতা স্বীকার করে সে বাতাস, ঢেউ ও স্রোতের বাধা জয় করে এগিয়ে যায়। নৌকা যদি হালের অধীনতা স্বীকার না করে স্বাধীন হয়ে চলতে চায় তাহলে সে প্রতিটি ঢেউয়ের নিকট পরাজিত হতে বাধ্য। স্রোত ও বাতাসের গোলাম হওয়া ছাড়া তার উপায় থাকে না।

আল্লাহর গোলামদের সবাই এক মানের হয় না। খুব কম লোকই উন্নত মানের হয়। আর সবই সাধারণ মানের।

(ক) সাধারণ মানের যারা তাদেরকে 'ইবাদুল্লাহ' বলা হয়।

(খ) আর যারা উন্নত মানের তাদেরকে 'আওলিয়াউল্লাহ' বলা হয়।

www.amarboi.org

ইবাদুল্লাহ ঃ عِبَادُ اللّٰهِ

ইবাদুল্লাহ মানে আল্লাহর দাসগণ। আবদ মানে দাস। এর বহুবচন হলো ইবাদ। দাসের কাজ হলো মনিবের হুকুম মেনে চলা। হুকুম মানতে হলে পয়লা জানতে হবে যে মনিব কী কী হুকুম করেছেন।

ইসলামী আন্দোলন তার কর্মীর জন্য যে রুটিন দিয়েছে তা আল্লাহর গোলাম বা বান্দাহ হওয়ারই সুযোগ করে দেয়। এ রুটিন যারা পালন করে তারাই শুধু কর্মী বলে গণ্য হয়। এ রুটিন অনুযায়ী সপ্তাহ ভরা দু'রকম কাজ করতে হয় এবং এ কাজের রিপোর্ট সংগঠনকে দিতে হয়। এক রকম কাজ হলো কর্মীকে আল্লাহর দাস হিসেবে গড়ে উঠবার উদ্দেশ্যে, অপরটি হলো অন্যদেরকে এ পথে আনার চেষ্টা।

আল্লাহর দাস হিসেবে গড়ে উঠতে হলে দ্বীনের ইলম দরকার এবং যতটুকু ইলম হলো সে অনুযায়ী আমল করতে হবে। তাই রুটিন অনুযায়ী রোজ কুরআনের কয়েক আয়াত বুঝে পড়া, কমপক্ষে একখানা হাদীস শেখা, ১০ পৃষ্ঠা ইসলামী বই পড়া, জামায়াতে নামায আদায় করা কর্মীদের জন্য বাধ্যতামূলক। সাপ্তাহিক বৈঠকে আরও কিছু শেখার সুযোগ হয়। সংগঠন কুরআন শুদ্ধ করে পড়া ও মাসলা মাসায়েল শেখার উপরও জোর দেয়। এভাবেই আল্লাহর বান্দাহ হিসেবে গড়ে উঠবার মহা-সুযোগ সংগঠনে রয়েছে। এ উদ্দেশ্যে সংগঠন কর্মীদের জন্য নিয়মিত ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করে। অগ্রসর কর্মীদের জন্য বিশেষ ট্রেনিং-এর ব্যবস্থাও করা হয়।

ইবাদুল্লাহর মর্যাদা পেতে হলে এ মযবুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, আমি নফসের গোলামী করব না। নফস মানে দেহের দাবী। দুনিয়ার সব রকম মজাভোগ করার জন্য দেহ দাবী জানাতেই থাকে। কিন্তু রূহ বা বিবেক তার মন্দ দাবীর প্রতিবাদ করে। ভাল ও মন্দ সম্পর্কে সব মানুষই জানে। তাই নাফস মন্দ কাজের হুকুম করলে বিবেক আপত্তি জানায়। নফস যদি রূহের চেয়ে বেশি সবল হয়, তাহলে বিবেকের আপত্তি সত্ত্বেও নফসের দাবী অনুযায়ী মন্দ কাজ করা হয়ে যায়।

তাই নফসের দাসত্ব থেকে নিজেকে রক্ষা করে আল্লাহর সত্যিকার দাস হতে হলে ৩ টা কাজ করতে হবে ঃ

১. এ সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, রূহের মতের বিরুদ্ধে কিছুতেই চলব না। নফসকে আমার মনিব হতে দেব না।

www.amarboi.org

২. জামায়াতে নামায আদায় করে ও রমযানে রোযা রেখে এবং শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে ও প্রতি মাসে ২/৩ টা করে নফল রোযা রেখে রূহকে নফসের উপর শক্তিশালী করতে হবে।

৩. সব সময় সতর্ক থাকতে হবে যেন রূহ ও নফসের এ লড়াইতে নফস কোন সময় জয়ী হতে না পারে, যদি কোন সময় জয়ী হয়ে যায়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তাওবা করতে হবে।

আওলিয়াউল্লাহ اَوْلِيَآءُ اللّٰهِ

আউলিয়া শব্দটি ওয়ালীর বহুবচন। ওয়ালী অর্থ সাহায্যকারী, বন্ধু, অভিভাবক, সমর্থক, রক্ষক, পৃষ্ঠপোষক ইত্যাদি। ওয়ালী শব্দটি আল্লাহর জন্য ব্যবহার করা হয়, আল্লাহর বান্দাহর জন্যও ব্যবহার করা হয়। যেমন-

'যারা ঈমানদার আল্লাহ তাদের ওয়ালী اَللّٰهُ وَلِیُّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا

আল্লাহ মু'মিনদের ওয়ালী' وَاللّٰهُ وَلِیُّ الْمُؤْمِنِیْنَ

نَحْنُ اَوْلِيَآءُكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ –

'আমি (আল্লাহ) দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের ওয়ালী'

ওয়ালী শব্দটি বান্দাহর জন্য ব্যবহার করার উদাহরণ ঃ

اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ–

'জেনে রাখ নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়ালীদের কোন ভয় ও হতাশা নেই।'

এ শব্দটি যখন আল্লাহর জন্য ব্যবহার করা হয়; তখন এর অর্থ হয় অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক, সাহায্যকারী। আর যখন আল্লাহর বান্দাহর জন্য ব্যবহার করা হয়, তখন এর অর্থ দাঁড়ায় আল্লাহর স্নেহভাজন বন্ধু। কোন মানুষকে আল্লাহর ওয়ালী বললে তাকে আল্লাহর অতি আদরের বান্দাহ ও স্নেহের দাসই মনে করতে হবে। অর্থাৎ সাধারণ দাস নয়, প্রিয় দাস বা পেয়ারা বান্দাহ।

www.amarboi.org

একই শব্দ আল্লাহ ও বান্দাহর জন্য ব্যহার করার আর একটি উদাহরণ হলো মু'মিন শব্দ। ঈমানদার মানুষকে মু'মিন বলা হয়। আবার কুরআনে আল্লাহর গুণবাচক নামগুলোর মধ্যে মু'মিন শব্দটিও রয়েছে।

اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ ـ

এখানে মু'মিন অর্থ নিরাপত্তাদাতা বা নিরাপত্তা বিধানকারী। এ শব্দটি যখন মানুষের জন্য ব্যবহার করা হয় তখন এর অর্থ হবে 'যে নিরাপত্তা পেল' বা নিরাপদ হলো। اَمْنٌ শব্দ থেকে ঈমান ও মু'মিন শব্দ গঠিত হয়েছে। আমন মানে নিরাপত্তা।

আল্লাহর ওয়ালীর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে ঃ

১। আল্লাহর হুকুমকে মহব্বতের সাথে পালন করা। সাধারণ বান্দারা আল্লাহকে ভয় করে তাঁরা হুকুম মেনে চলে। এটাকে বলা হয় তাকওয়া। মহব্বত করে পালন করাকে ইহসান বলা হয়।[২] মনিবের শাস্তির ভয় থেকে বাঁচার জন্য যদি কাজ করা হয়, তাহলে সে কাজ এত সুন্দর হয় না, মহব্বতের সাথে করলে যত সুন্দর হয়।

তাকওয়া ও ইহসানে এটাই পার্থক্য। আল্লাহর সাধারণ দাস ও আল্লাহর ওয়ালীর মধ্যে এখানেই পার্থক্য।

২। কোন অবস্থায়ই আল্লাহর নাফরমানী না করা। আল্লাহর হুকুম দু'রকম। এটা হলো আদেশ, অপরটি নিষেধ।

আল্লাহর সব আদেশ পালন করার সুযোগও সবার হয় না। যাকাত ও হজ্জ পালন করা শুধু ধনীর পক্ষেই সম্ভব। ইনসাফ কায়েম করা, যালিমকে শাস্তি দেয়া, বাতিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার যোগ্যতা, সুযোগ ও দায়িত্ব সবার নেই।

কিন্তু আল্লাহর নিষেধগুলো মেনে চলা সবার পক্ষেই সম্ভব। অর্থাৎ আল্লাহর সব আদেশ পালন করতে না পারলেও সব নিষেধ পালন করা যায়। আল্লাহর সব নিষিদ্ধ ও অপছন্দনীয় কাজ না করা বা তা হতে নিজকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য টাকা পয়সার দরকার হয় না। মযবুত ইরাদাই এর জন্য জরুরী।

---

২. এ বিষয়ে মাওলানা মওদূদী (রা.)-এর লেখা "ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি" বইটি দেখুন।

www.amarboi.org

আল্লাহর ওয়ালী এ বিষয়ে বড়ই সতর্ক। কোন অবস্থায় যেন এমন কাজ হয়ে না যায় যাতে আল্লাহ্ পাক অসন্তুষ্ট হন। আল্লাহ্‌র খাঁটি মহব্বতই এ যোগ্যতা সৃষ্টি করে। আল্লাহ্‌র ওয়ালীদের কথাই হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ পাক এভাবে বলেছেন, 'তাদের কান আমার কান হয়ে যায় যা দিয়ে তারা শুনে, তাদের চোখ আমার চোখ হয়ে যায় যা দিয়ে তারা দেখে, তাদের হাত আমার হাত হয়ে যায় যা দিয়ে তারা ধরে, তাদের পা আমার পা হয়ে যায় যা দিয়ে তারা চলে।'

অর্থাৎ তাঁরা তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কখনও আল্লাহ্‌র অপছন্দনীয় কাজে ব্যবহার করে না।

৩। সকল অবস্থায় আল্লাহ্‌র উপর সন্তুষ্ট থাকা। দুনিয়ায় আপদ-বিপদ, দুঃখ-কষ্ট, শোক-তাপ কমবেশী সবার জীবনেই আসে। নবী-রাসূলগণও এ থেকে মুক্ত ছিলেন না। আল্লাহকে মহব্বত করার কারণে সব অবস্থায়ই আল্লাহর ওয়ালী মনে সান্ত্বনা পায় যে, এর মধ্যে নিশ্চয়ই মঙ্গল রয়েছে। আল্লাহর ইচ্ছায়ই বিপদ আসে। আর তিনি বান্দাহর মঙ্গলের জন্যই সব কিছু করেন। এ বিশ্বাসের কারণে আল্লাহর ওয়ালী কোন কঠিন অবস্থায়ও পেরেশান হয় না, ঘাবড়ায় না বা হতাশ হয় না। আল্লাহ্‌র উপর দৃঢ় আস্থা ও আল্লাহর ইচ্ছার উপর পূর্ণ ভরসা থাকায় তাদের মনের অবস্থা হলো যে সব অবস্থায়ই তারা আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জানায়। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের রুটিনের একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আত্মসমালোচনা। অর্থাৎ নিজের হিসাব নিজেকেই নেওয়ার ব্যবস্থা। হাদীসে আছে اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ 'বুদ্ধিমান ঐ লোক যে নিজের নফসের বিচার করে বা সমালোচনা করে।' এ বিষয়টাই আল্লাহর ওয়ালীর মর্যাদা পেতে সাহায্য করে। কর্মী আত্মসমালোচনা করবে ঐ তিনটা পয়েন্টে যা ওয়ালীর বৈশিষ্ট্যে উল্লেখ করা হয়েছে। রোজ একটা নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত সে নিজেকে প্রশ্ন করবে ঃ

১। আমি কি মহব্বতের সাথে আল্লাহর আদেশ পালন করছি?

২। আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কি আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ থেকে সব সময় ফিরিয়ে রাখতে পেরেছি?

www.amarboi.org

৩। আমি কি সব সময় আমার মনিবের উপর সন্তুষ্ট থেকে তার শুকরিয়া আদায় করছি?

যে ব্যক্তি নিয়মিত নিষ্ঠার সাথে রোজ এভাবে আত্ম-সমালোচনা (ইহতিসাবে নাফস) করতে থাকবে এবং সে অনুযায়ী নিজেকে সংশোধনের চেষ্টা করবে, তার মধ্যে ধীরে ধীরে ঐ সব গুণ সৃষ্টি হওয়ার আশা করা যায়। আমাদের একথা মনে রাখতে হবে যে, আমাদের জীবনের দোষত্রুটি দূর করে এ পথে এগুতে হলে নিজেকেই সাধনা করতে হবে। আর কেউ আমার জন্য এ সাধনা করে দিতে পারবে না।

প্রশ্ন হতে পারে যে, ইসলামী আন্দোলনের কঠিন দায়িত্ব পালনের সাথে পার্থিব কর্তব্য ও পারিবারিক ঝামেলা পোহায়ে আল্লাহর ওয়ালী হওয়ার সাধনা করা কিভাবে সম্ভব? জনগণের মধ্যে দাওয়াতী দ্বীনের দায়িত্ব পালন না করে সামজ সেবা ও সমাজ কল্যাণমূলক কাজ করার ঝামেলা না পোহায়ে পারিবারিক দায়িত্বের বোঝা এড়িয়ে নির্জনে নফল ইবাদতে যারা মশগুল তাদেরকেই ওয়ালীউল্লাহ বলে মনে করা হয়। এটা প্রচলিত ভুল ধারণা। সাহাবা কিরামের (রা.) চেয়ে বড় ওয়ালী আর কে হতে পারে? তাদের জীবনই আমাদের আদর্শ। তাদের থেকে ভিন্ন ধরনের জীবন মু'মিনদের জন্য আদর্শ হতে পারে না।

এক সফরে রাসূল (সা.)-এর সামনে কয়েকজন সাহাবী তাদের এক সাথীর প্রশংসা করছিলেন। রাসূল (সা.) প্রশংসার কারণ জানতে চাইলেন। তারা বললেন, এখানে সফর মুলতবী করার সাথে সাথে আমরা সবাই তাবু খাটানো, ঘোড়া বাঁধা ও ঘোড়ার খাবার দেয়া, সামানপত্র গুছিয়ে রাখা ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। আর ঐ ভাইটি এসেই নফল নামাযে মশগুল হয়ে গেলেন। রাসূল (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের ভাইটির ঘোড়া ও সামান সামলালো কে? তাঁরা বললেন, আমরাই সব কিছু করে দিয়েছি। রাসূল (সা.) মন্তব্য করলেন, 'তোমরা সবাই তার চেয়ে ভাল।' এ ঘটনাটিই উদাহরণ হিসেবে যথেষ্ট।

যে কারণে সমাজে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের এত অভাব রয়েছে, এমন কি কালেমা তাইয়্যেবার মর্মকথা পর্যন্ত জনগণ জানে না, সে কারণেই ওয়ালিউল্লাহ সম্পর্কেও মানুষের সঠিক ধারণা নেই। সংসার-ত্যাগী, যিকর-আযকারে মশগুল, সুফীয়ানা লেবাসধারী ও সুন্দর চেহারার কোন লোক

www.amarboi.org

দেখলে মানুষ তাকে আল্লাহর ওয়ালী বলে ভক্তি করে। কিন্তু আল্লাহ কাকে তার ওয়ালী বলে গণ্য করেন তা মানুষের জানবার উপায় নেই।

আল্লাহর ওয়ালীর যে কয়টি বৈশিষ্ট্য এখানে আলোচনা করা হয়েছে, তা এমন সব গুণ যা দেখা যাওয়ার জিনিস নয়। তাছাড়া সত্যিকার ওয়ালী যারা তারা মোটেই পছন্দ করেন না যে, লোকেরা তাকে ওয়ালী বলে ভক্তি করুক। বরং তারা নিজেদেরকে আল্লাহর নিকৃষ্ট দাসই মনে করেন।

আসল কথা হলো আল্লাহর সাথে গভীর মহব্বত সৃষ্টি করা। শেষ রাতে যখন দুনিয়া ঘুমে মগ্ন তখন আল্লাহর দুয়ারে ধরণা না দিলে ঐ মহব্বত অনুভব করা যায় না। আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, 'শেষ রাতে জাগা তোমাদের কর্তব্য, কেননা, এটা সালেহ লোকদের তরীকা, তোমাদের রবের নৈকট্য লাভের উপায়, অতীত গুনাহর কাফফারা ও ভবিষ্যৎ গুনাহর নিরাপত্তা।'

যার ঈমান আছে তার নাফসের সাথে রূহের লড়াই চলে। কোন সময় নাফস জয়ী হয়, আবার কোন সময় রূহ জয়ী হয়। নাফসের এ অবস্থার নাম নাফসে লাওয়ামাহ।

যার রূহ এত শক্তিশালী যে সব সময় সে জয়ী হয় এবং কোন সময় নাফস জয়ী হতে পারে না, তার নাফসের অবস্থার নাম নাফসে মুৎমাইন্নাহ। নাফস এখানে সম্পূর্ণ পরাজিত। এ অবস্থায় নাফস ও রূহের লড়াই খতম। নাফস রূহের সম্পূর্ণ অনুগত ও শান্ত। যে এ অবস্থায় পৌঁছে সেই আল্লাহর ওয়ালী বা ওয়ালীউল্লাহ।

৫. আল্লাহর খলীফা হওয়ার জয্‌বা خُلَفَاءُ اللّٰهِ

খুলাফাউল্লাহ خُلَفَاءُاللّٰهِ

খলীফা শব্দের বহুবচন খুলাফা। খলীফা অর্থ প্রতিনিধি। প্রতিনিধির কাজ হলো যে যার প্রতিনিধি তার পক্ষ থেকে তার মরযী মতো কাজ করা।

اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً – 'আমি যমীনে খলীফা নিযুক্ত করতে যাচ্ছি' *(সূরা আল বাকারাহ ৩০ আয়াত)* বলে ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ পাক আদম সৃষ্টি করলেন। তাহলে দুনিয়াতে আল্লাহরই একটা কাজ তার পক্ষ থেকে করার

www.amarboi.org

দায়িত্ব মানুষকে দেয়া হয়েছে। ঐ কাজটি করলে মানুষ খলীফাতুল্লাহর মর্যাদা পাবে।

সে কাজটিকেই খিলাফতের কাজ বলা হয়। খেলাফতের বা প্রতিনিধিত্বের ঐ কাজটিকে বুঝবার জন্য আল্লাহ্ তায়ালার সৃষ্টি কৌশলকে জানতে হবে।

আল্লাহ্ তায়ালার অগণিত সৃষ্টির মধ্যে ৩ প্রকার সৃষ্টিকে তিনি নৈতিকতাবোধ বা ভালো ও মন্দের পার্থক্য বুঝবার যোগ্যতা দিয়েছেন। তারা হলো ফেরেশতা, জিন ও মানুষ। এ তিন রকম সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য হলো, ফেরেশতা ভালো-মন্দ সম্পর্কে সচেতন বটে কিন্তু তাদেরকে নিজেদের মরযী মতো ভালো বা মন্দ কোনটাই করাই ইখতিয়ার দেয়া হয়নি। তাদের দায়িত্ব হলো- يَفْعَلُوْنَ مَايُؤْمَرُوْنَ— অর্থাৎ তাদেরকে যা করতে বলা হয় তারা তাই করে। *(সূরা আন-নাহল ৫০ আয়াত)*

তারা আল্লাহ্ পাকের বিশাল বিশ্ব-কারখানার কর্মচারী।

তারা আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য বলে তারা কখনও মন্দ কাজ করে না। তাই তাদের দোযখে যাওয়া বা শাস্তি পাওয়ার কোন কারণ নেই। তাদের পুরস্কার পাওয়ারও কথা নয়। কারণ তারা যত ভালো কাজই করুক তাতে তাদের কোন কৃতিত্ব নেই। তারা সবই বাধ্য হয়ে করেন। কিন্তু জিন ও মানুষকে ভালো বা মন্দ কোনটা করার জন্যই আল্লাহ্ বাধ্য করেননি। তাদেরকে ইখতিয়ার দিয়েছেন যে নিজের ইচ্ছায় ভালো বা মন্দ করতে পারবে। তাই তারা পুরস্কার বা শাস্তি পাবে। মন্দ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ভালো করায় তাদের কৃতিত্ব আছে বলেই পুরস্কার পাবে। আর ভালো করার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও মন্দ করায় তারা দোষী বলেই শাস্তি পাবে।

কিন্তু জিন ও মানুষের মধ্যে আবার পার্থক্য আছে। আল্লাহ্ তায়ালা জিনের উপর আল্লাহর দ্বীন পালনের কর্তব্য আরোপ করলেও জিনকে খিলাফতের দায়িত্ব দেননি। খিলাফতের দায়িত্ব শুধু মানুষের উপরই দেয়া হয়েছে। এখন খিলাফতের এ দায়িত্বটা কী তা বুঝা দরকার।

www.amarboi.org

খিলাফতের দায়িত্ব

আল্লাহ তায়ালা যত কিছু সৃষ্টি করেছেন তাদের প্রত্যেকের জন্য বিধান বা নিয়ম-কানুন তৈরি করেছেন। মহা শক্তিশালী বিশাল সৃষ্টি সূর্য থেকে শুরু করে অণু-পরমাণু পর্যন্ত প্রতিটি সৃষ্টি তার জন্য স্রষ্টার দেয়া নিয়ম বাধ্য হয়ে মেনে চলে। ঐ নিয়ম পালন না করে নিজের মরযী মতো চলার ক্ষমতা কারো নেই। তাদেরকে মানা বা না মানার কোন ইখতিয়ার দেয়া হয়নি। গোটা সৃষ্টি জগত আল্লাহর রচিত নিয়মের রাজত্বের সম্পূর্ণ অধীন।

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا ـ

মানুষ কি আল্লাহর বিধান ছাড়া (অন্য বিধান) তালাশ করে? অথচ আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবাই আল্লাহর নিকট বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পণ করেছে।
(আলে ইমরান ৮৩ আয়াত)

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এ কথাই বলতে চান যে হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে আমার রচিত বিধানকে মানতে বাধ্য করিনি বলে কি তোমরা সে বিধানকে অমান্য করে চলতে চাও? তোমরা জেনে রাখ যে, আর সবাই আমার দেয়া বিধান মেনে চলছে। কারণ তাদেরকে আমি মানতে বাধ্য করেছি। তারা মানতে বাধ্য বলেই তাদের কোন বাহাদুরী নেই এবং তারা কোন মর্যাদারও অধিকারী নয়। কিন্তু তোমাদেরকে আমি সম্মান ও মর্যাদা দিতে চাই। সেটা হলো আমার খিলাফতের মর্যাদা।

আমার রচিত বিধান গোটা সৃষ্টি জগতে আমি নিজেই জারী করি। সে বিধান আমি কোন নবীর মারফতে তাদের কাছে পাঠাইনি। কিন্তু হে মানুষ, তোমাদের জন্য রচিত বিধান আমি নবীর মারফতে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি এবং তা আমি নিজে জারীও করি না। সে আইন ও বিধান আমারই রচিত। আমার ঐ আইনকে আমার পক্ষ থেকে আমার পছন্দনীয় নিয়মে জারী করার দায়িত্ব আমি নবী ও তাঁর প্রতি ঈমানদারদের উপর দিয়েছি।

হে মানুষ, তোমরা যদি নবীর মাধ্যমে প্রেরিত বিধানকে আমার পক্ষ থেকে জারী কর, তাহলে তোমরা আমার খলীফার মর্যাদা পাবে, যে মর্যাদা আমি জ্বিন ও ফেরেশতাকে দেইনি। এ মর্যাদা ও সম্মান পাওয়ার সুযোগ দেয়ার জন্যই আমি তোমাদেরকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছি।

www.amarboi.org

তাই আল্লাহর খলীফার মর্যাদা পেতে হলে আল্লাহর আইন কায়েমের জন্য চেষ্টা করতে হবে। ইসলামী আন্দোলন আল্লাহর আইন কায়েমের জন্যই সংগ্রাম করে যাচ্ছে। আল্লাহর আইন কায়েমের জন্য যে ধরনের সৎ লোক দরকার এ আন্দোলন সে মানের লোক তৈরি করার জন্যই কর্মীদেরকে এক বিশেষ রুটিন মেনে চলার জন্য ব্যবস্থা করেছে। রাসূল (সা.) ১৩ বছর পর্যন্ত লোক তৈরি করার পর মদীনায় আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েম করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বাংলাদেশে আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েমের জন্য ইসলামী আন্দোলন ঐ নিয়মেই কাজ করে যাচ্ছে।

প্রসঙ্গক্রমে মানুষকে খিলাফতের যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সে বিষয়ে দুটো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা আলোচনা করা দরকার।

মানুষের জন্যই পৃথিবীর সৃষ্টি

১। আল্লাহ তায়ালা গোটা সৃষ্টিজগতকে ব্যবহার করার ক্ষমতা মানুষকে দিয়েছেন। তাই এ পৃথিবীর সব কিছু মানুষের জন্য পয়দা করা হয়েছে বলে কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে -

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ـ

'হে মানুষ! তিনিই ঐ সত্তা যিনি তোমাদের জন্য সব কিছু পয়দা করেছেন যা পৃথিবীতে আছে।' *(সূরা আল বাকারাহ ২৯ আয়াত)*

মানুষ যাতে নিজের ইচ্ছা মতো আল্লাহর সৃষ্টিজগতকে ব্যবহার করতে পারে, সে জন্যই এত ক্ষমতা মানুষকে দেয়া হয়েছে। সত্যিই চিন্তা করে দেখলে বুঝা যায় যে, মানুষকে আর কোন সৃষ্টির প্রয়োজনে পয়দা করা হয়নি, আর সবাইকে মানুষের জন্য পয়দা করা হয়েছে। যেমন- পশু-পাখী, গাছ-পালা, আগুন-পানি, চন্দ্র-সূর্য, বাতাস-ইথার ইত্যাদি ছাড়া মানুষের চলে না বলেই এ সব পয়দা করা হয়েছে। কিন্তু মানুষ না থাকলে ঐ সব সৃষ্টির কোন অসুবিধা হতো না। তাই মানুষ সৃষ্টির আগেই আসমান-যমীনের সব কিছু পয়দা করা হয়েছে যাতে মানুষের কাজে লাগে। মানুষ ছাড়া যদি তাদের না চলতো, তাহলে মানুষ পয়দা হওয়ার আগে তারা কেমন করে বেঁচে ছিল?

পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু ও শক্তি মানুষের প্রয়োজনে পয়দা করার কারণেই একমাত্র মানুষই বিজ্ঞানের উন্নতি করছে। জিন জাতি বিজ্ঞান চর্চা করে

www.amarboi.org

সৃষ্টিজগতকে নিজেদের জন্য এভাবে ব্যবহার করেছে বলে কোন প্রমাণ নেই। দুনিয়ার যত বস্তু ও বস্তুগত শক্তি রয়েছে তা জানা ও মানুষের কাজে লাগানোই হলো বিজ্ঞানের দায়িত্ব। এ দায়িত্ব মানুষ পালন করে।

মানুষ শুধু খলীফা

খলীফার নিজস্ব মালিকানা ক্ষমতা নেই। সে যার খলীফা মালিকানা তারই। সে হিসেবে মানুষ দুনিয়ায় খলিফা হিসেবে প্রেরিত হবার অর্থ হলো এই যে তাকে কারো না কারো খলীফাই হতে হবে। খলীফা হওয়াই দুনিয়ায় তার একমাত্র মর্যাদা। এখানে মনিব হওয়ার কোন সুযোগ তার নেই।

তাই যদি মানুষ আল্লাহর খলীফার মর্যাদা হাসিলের চেষ্টা করে, তবেই তার সম্মান বহাল থাকবে এবং আখিরাতেও মর্যাদার অধিকারী হবে। কিন্তু যদি সে এ বিষয়ে অবহেলা করে, তাহলে সে যোগ্যতা থাকলে ইবলীসের খলীফা হবে। যদি সে যোগ্যতাও না থাকে, তাহলে ইবলীসের কোন মানুষ-খলীফার তস্য খলীফা হবে। কিন্তু তাকে খলীফাই হতে হবে। তার আর কিছু হওয়ার উপায় নেই।

কুরআন পাকের একটি আয়াত থেকে এর মযবুত প্রমাণ পাওয়া যায়।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَاتَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ـ

‘হে ঐ সব লোক যারা ঈমান এনেছ, তোমরা পুরাপুরি ইসলামে দাখিল হও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না।’ *(সূরা আল বাকারা-২০৮ আয়াত)*

এ আয়াতটি বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে আল্লাহ পাক বলছেন, যারা ঈমানদার হওয়ার দাবীদার, তাদের জীবনের সব ব্যাপারেই ইসলামের বিধান মেনে চলা কর্তব্য। যদি জীবনের কোন এক দিকে তোমরা ইসলামের বিধান কবুল না কর, তাহলে সে দিকটা খালি পড়ে থাকবে না। সেখানে তোমরা কোথাও না কোথাও থেকে বিধান নিতে বাধ্য হবে। ইসলাম ছাড়া আর যেখান থেকেই কোন বিধান নেবে সেটা অবশ্যই হয় ইবলীসের তৈরি, আর না হয় তার কোন খলীফার তৈরি। বিধান শুধু দু' জায়গায়ই আছে, হয় আল্লাহর বিধান মান, তা না হলে তোমার অজান্তেই তুমি ইবলীসের পাল্লায় পড়বে। অর্থাৎ হয় আল্লাহর খলীফা হও, নইলে ইবলীসের খলীফা হতে হবে। তোমার খলীফা হওয়া ছাড়া আর কিছুই হওয়ার উপায় নেই।

www.amarboi.org

এ কারণেই যে সত্যিকার মুসলিম, সে জীবনের সব ক্ষেত্রেই মুসলিম থাকার চেষ্টা করে। এক ব্যক্তি ধর্মের দিক দিয়ে মুসলিম, রাজনৈতিক দিক দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পুঁজিবাদী বা সমাজতন্ত্রী, সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে ভোগবাদী, দর্শনে বস্তুবাদী, সমাজতত্ত্বে দ্বান্দ্বিকতাবাদী হতে পারে না। ইসলামী জীবন বিধানকে কবুল করলে জীবনের সকল দিকেই তাকে মুসলিম হতে হবে।

৬. আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার জয্বা شُهَدَاءُ لِلّٰهِ

'শহীদ' শব্দের বহুবচন 'শুহাদা'। এর শাব্দিক অর্থ সাক্ষী। ইসলামী পরিভাষায় শহীদ মানে আল্লাহর পথে নিহত বা জীবন দাতা। যে আল্লাহর দীনের স্বার্থে জানের কুরবানী দিল সে এ কথারই সাক্ষ্য দিল যে সে আল্লাহর দীনকে নিজের চেয়েও বেশি ভালবাসে। যে মহৎ কোন উদ্দেশ্যে জীবন দিল তার জন্য 'শহীদ' পদবীর চেয়ে বেশি মর্যাদাবান পরিভাষা আর কোন ভাষায় নেই। তাই এ পরিভাষাটি এত জনপ্রিয় যে ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে যে কোন উদ্দেশ্যে নিহত হলেই শহীদ উপাধি দেওয়া হয়। অবশ্য আল্লাহর নিকট সবাই শহীদের মর্যাদা হয়তো পাবে না।

শাহাদাতের জয্বা

বাইয়াত বিল্লাহর মানেই হলো জান ও মাল আল্লাহর পথে কুরবানী করার ঘোষণা। কুরআন পাকে এ ঘোষণাটি সূরা আল আনয়ামের ১৬১নং আয়াতে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে,

اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ .

'আমার নামায আমার যাবতীয় ইবাদাত আমার হায়াত ও মওত আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য।' এটাই শাহাদাতের জয্বার সুন্দরতম প্রকাশ।

আমাদের কর্তব্য হলো আমাদেরকে আল্লাহর দীন কায়েমের পথে উৎসর্গ করে শাহাদাতের জয্বা নিয়ে দায়িত্ব পালন করতে থাকা। আমার নিকট থেকে দ্বীনের খেদমত কিভাবে ও কতটুকু নেবেন তা আমার মা'বুদের ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে। তিনি আমাকে বাতিলের হাতে নিহত হয়ে শহীদ হওয়ার সহজ গৌরব দান করবেন, না ইসলামের বিজয়ের পর আল্লাহর আইন জারী করার

www.amarboi.org

কঠিন দায়িত্ব অর্পণ করবেন, তা সম্পূর্ণ তারই মরযী। নিশ্চিন্ত মনে আমাকে উভয় অবস্থার জন্য তৈরি থাকা উচিত।

উহুদের যুদ্ধে ৭০ জন সাহাবী শহীদ হন এবং বদরের যুদ্ধে বিজয়ের পর এটা পরাজয় বলেই গণ্য। এ যুদ্ধ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা মন্তব্য করেছেন যে

اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ط وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ج وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاۤءَ ط وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ –

'তোমাদের উপর যদি আঘাত এসে থাকে, তাহলে দুশমনদের উপরও (বদরে) এমনি আঘাত এসেছিল। এটা সময়ের উঠানামা যা মানুষের মধ্যে আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আনি। এটা এ জন্য যে, আল্লাহ দেখতে চান যে, তোমাদের মধ্যে সত্যিকার মুমিন কারা। আর তোমাদের থেকে কিছু লোককে শহীদ হওয়ার মর্যাদা তিনি দিতে চান। আল্লাহ যালিমদেরকে পছন্দ করেন না।'

(সূরা আলে ইমরান ১৪০ আয়াত)

এ দ্বারা বুঝা গেল যে, কিছু লোককে শহীদ হওয়ার সুযোগ দান করাও আল্লাহ পাকেরই পরিকল্পনা।

বদর ও উহুদ যুদ্ধ থেকে শুরু করে খোলাফায়ে রাশেদীনের ৪ জনই প্রতিটি যুদ্ধে শরীক ছিলেন। পরবর্তী সময়ে তাদেরকে যে খিলাফতের দায়িত্ব পালন করতে হবে সে কথা তাদের জানাও ছিল না। তাই ঐ দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে তারা গা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন বলে মনে করার কোন কারণ নেই। কে শহীদ হবে কে গাযী হবে তার ফায়সালা একমাত্র আল্লাহই করেন।

বর্তমানেও ইসলামী আন্দোলনে ছাত্র ও অছাত্র যারা শহীদ হচ্ছেন, তাদেরকে আল্লাহ পাকই এ উদ্দেশ্যে বাছাই করে নিয়েছেন। বাতিলের সাথে সংঘর্ষ হচ্ছে দেখে ভীত হয়ে পিছিয়ে থাকা বাইয়াত বিল্লাহর সম্পূর্ণ খেলাফ এবং তা মুনাফিকীর স্পষ্ট আলামত। আবার এদিকেও খেয়াল রাখতে হবে যে, শহীদ হওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বিনা পরিকল্পনা ও সংগঠনের সিদ্ধান্ত ছাড়াই দুশমনের হাতে জান তুলে দেয়াও সঠিক নয়।

www.amarboi.org

শাহাদাতের কামনা

মানুষের কাছে তার জীবনের চেয়ে প্রিয় আর কিছুই নয়। তাই দুশমনের আঘাতে নিহত হওয়ার কামনা করা মোটেই স্বাভাবিক নয়। আবার একথাও সত্য যে মানুষ বৃহত্তর কল্যাণ লাভের জন্য সব রকম কুরবানী দিতে সক্ষম।

যে এ কথা বিশ্বাস করে যে আল্লাহর পথে শহীদ হলে আল্লাহর দরবারে উচ্চ মর্যাদা লাভ করা যাবে এবং বিনা হিসাবে বেহেশতে যাওয়া যাবে, তার মধ্যে শাহাদাতের জযবা প্রবল হওয়াই স্বাভাবিক।

মৃত্যু নির্দিষ্ট সময়ে অবশ্যই আসবে। আমার মৃত্যু জিহাদের ময়দানে আসলো, না ফাঁসির মঞ্চে এলো, না বিছানায় পড়ে থাকা অবস্থায় হলো তাতে কি কোন পার্থক্য নেই? যে মৃত্যু আখিরাতে গৌরব বয়ে আনবে সে মৃত্যুই তো আমার আকাঙ্ক্ষা হওয়া উচিত।

হাদীসে আছে যে, শহীদ আঘাতের বেদনা বোধ করে না এবং মৃত্যুর যন্ত্রণাও ভোগ করে না। তাহলে মরতেই যখন হবে তখন গৌরবের মৃত্যুই কামনা করা বুদ্ধিমান মুমিনের লক্ষণ।

রাসূল (সা.) এরশাদ করেন ঃ

مَنْ سَئَلَ اللّٰهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللّٰهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَاِنْ مَاتَ عَلٰى فِرَاشِهِ –

‘যে সত্য সত্যই আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর নিকট শাহাদাতের দোয়া করে সে যদি তার বিছানায়ও মৃত্যুবরণ করে তবুও আল্লাহ্ তাকে শহীদদের মর্যাদায় পৌঁছাবেন।’

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য এর চেয়ে বড়ো কোন সুসংবাদ হতে পারে না। আল্লাহ্ কিভাবে আমার মৃত্যু দেবেন তা আমার জানা নেই। কিন্তু আমি যদি তাঁর দরবারে শাহাদাতের মর্যাদা পেতে চাই তাহলে এ দোয়া করাই আমার কর্তব্য।

www.amarboi.org

এক নযরে ৬টি জয্‌বা

জয্‌বার নাম	কুরআনের পরিভাষা	উচ্চারণ
১। আল্লাহর প্রতি শুকরিয়ার জয্‌বা	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ	(ক) আলহামদুলিল্লাহ
	اَنْصَارُ اللّٰهَ	(খ) আনসারুল্লাহ
২। সহীহ নিয়্যতের জয্‌বা	رِضْوَانُ اللهَ	রিদওয়ানুল্লাহ
৩। বেহেশতে যাওয়ার জয্‌বা	بَيْعَةْ بِاللهِ	বাইয়াত বিল্লাহ
৪। আল্লাহর গোলাম হওয়ার জয্‌বা	عِبَادُ اللهِ	(ক) ইবাদুল্লাহ
	اَوْلِيَاۤءُ اللهَ	(খ) আওলিয়াউল্লাহ
৫। আল্লাহর খলীফা হওয়ার জয্‌বা	خُلَفَاۤءُ اللهِ	খুলাফাউল্লাহ
৬। আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার জয্‌বা	شُهَدَاۤءُ لِلّٰهِ	শুহাদাউলিল্লাহ

www.amarboi.org

ইসলামী আন্দোলন পূর্ণ ইসলাম চায়

বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলন দ্বীনের কোন একাংশের খেদমতের জন্য কাজ করছে না, পূর্ণ দ্বীনকে কায়েমের কর্মসূচী নিয়ে সংগ্রাম করছে। তাই আল্লাহ্র আইন কায়েম করার জন্য এক দল সৎলোক তৈরি করার উপযুক্ত রুটিনই কর্মীদেরকে দিয়েছে।

আল্লাহ্ তার মুমিন বান্দাহ্দের জন্য যে সব মর্যাদার কথা তার পাক কালামে উল্লেখ করেছেন তার সব কয়টি হাসিল করার সুযোগই ইসলামী আন্দোলনে রয়েছে। ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলন ছাড়া একই সাথে এ চারটি মর্যাদা পাওয়ার আর কোন উপায়ই নেই। আন্দোলন ও সংগঠনে যোগদান না করে যারা ব্যক্তিগত চেষ্টায় আল্লাহ্র দাস হওয়ার চেষ্টা করে, তাদের পক্ষে বেশি অগ্রসর হওয়া অসম্ভব এবং তাদের উন্নতিও অতি ধীর গতিতে হবে। আর যারা কোন হাক্কানী পীরের সহায়তায় সাধনা করতে থাকে, তারা হয়তো আল্লাহ্র ওয়ালীর মর্যাদাও পেতে পারে। কিন্তু বাকী দুটো মর্যাদা কী করে পাবে? তাবলীগ জামায়াতে কাজ করে আনসারুল্লাহ্র আংশিক মর্যাদা পেলেও খুলাফাউল্লাহ্র মর্যাদা বাকী থেকে যায়। তাবলীগ জামায়াতের দাওয়াত ইসলামের ধর্মীয় ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ বলে সেখানে কাজ করে আনসারুল্লাহ্র পূর্ণ মর্যাদা পাওয়ার আশা করা যায় না।

এ কারণেই বাতিলের সাথে মুকাবিলা করে এবং আল্লাহ্র কাছে জান ও মাল বিক্রয় করে আল্লাহ্র দ্বীনকে বিজয়ী করার আন্দোলনে ইসলামের সাথে আজীবন লেগে থাকা ছাড়া আওলিয়াউল্লাহ্, আনসারুল্লাহ ও খুলাফাউল্লাহ্র মর্যাদা হাসিল করা কিছুইতে সম্ভব নয়।

www.amarboi.org

সৎ লোক কী আর কোথাও তৈরি হয় না?

আল্লাহ্র আইন কায়েমের জন্য আন্দোলনে যোগদান না করে কি সৎ লোক তৈরি করা সম্ভব নয়? মাদরাসায় যে আলিম পয়দা হয়, পীরের খানকায় যে আল্লাহ্ওয়ালা তৈরি হয় এবং তাবলীগ জামায়াতের মাধ্যমে যে দ্বীনের জন্য মেহনতকারী সৃষ্টি হয় তারা কি ইকামাতে দ্বীনের যোগ্য বলে গণ্য হতে পারে না?

এ বিষয়ে পয়লা কথা হলো যে, ইকামাতে দ্বীন ও খেদমতে দ্বীনের মধ্যে যে পার্থক্য তা ভালো করে বুঝতে হবে। মাদরাসা, খানকাহ্ ও তাবলীগ জামায়াত নিঃসন্দেহে দ্বীনের বড় বড় খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছে। এ সব প্রতিষ্ঠানে যে ধরনের লোক তৈরি হচ্ছেন তারা অবশ্যই ইকামাতে দ্বীনের সহায়ক হতে পারেন। কিন্তু শুধু ঐটুকু কর্মসূচীর ফলে দ্বীন কায়েম হবে না। যদি হতো তাহলে বিগত শত শত বছরে এর প্রমাণ পাওয়া যেতো।

তাই আল্লাহ্র আইন কায়েমের জন্য যে ধরনের লোক তৈরি করা দরকার, তার জন্য উপযোগী কর্মসূচি প্রয়োজন। আর এ জাতীয় কর্মসূচি যখনই ময়দানে চালু করা হয়, তখন স্বাভাবিক কারণেই বাতিল শক্তি এর বিরুদ্ধে লেগে যায়। মাদরাসা, খানকাহ্ ও তাবলীগের কর্মসূচিকে বাতিল শক্তি তাদের জন্য বিপজ্জনক মনে করে না, তাই তাদের বিরুদ্ধে বাতিলের পক্ষ থেকে বাধা সৃষ্টি করা প্রয়োজন মনে করে না। বাতিলের আইন, শাসন ও কর্তৃত্ব পরিবর্তন করে আল্লাহ্র আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েমের কর্মসূচিকে বাতিল শক্তি কিছুতেই বরদাশত করে না। তাই হক ও বাতিলের মধ্যে সংঘর্ষ ও টক্কর হয়। নবীদের জীবনই একথার সাক্ষী। মানুষ হিসেবে নবীগণকে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত চরিত্রের বলে

www.amarboi.org

সবাই স্বীকার করতো। কিন্তু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এমনকি ধর্মীয় নেতৃত্বের অধিকারীরাও একজোট হয়ে নবীগণের বিরোধিতা করেছে।

আল্লাহর আইন কায়েমের জন্য যে ধরনের লোক দরকার তা হক ও বাতিলের সংঘর্ষের মাধ্যমেই শুধু যোগাড় হয়। কুরআন পাকে এ বিষয়ে বহু জায়গায় আলোচনা করা হয়েছে। এ সংঘর্ষ শুধু ইসলামী আন্দোলনের সাথেই হয়ে থাকে। মাদরাসা, খানকাহ ও তাবলীগের সাথে এ সংঘর্ষ হয় না।

মাদরাসা, খানকাহ ও তাবলীগ সরাসরি ইকামাতে দ্বীনের কর্মসূচি নিয়ে কাজ না করলেও এ সব প্রতিষ্ঠান দ্বীনের যে বিরাট খেদমত করছে তা ইকামাতে দ্বীনের খুবই সহায়ক শক্তি। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মাদরাসা থেকে আলিম হয়ে যারা ইসলামী আন্দোলনে আসেন, তাদের মধ্যে কুরআন-হাদীসের ইলম থাকার কারণে তারা অল্প দিনেই নেতৃত্বের দায়িত্ব পালনের যোগ্য বিবেচিত হন। মাদরাসাগুলো আছে বলেই ইসলামী আন্দোলন বিরাট সংখ্যক রেডীমেড আলেম পেয়ে গেছে।

খানকাহ ও তাবলীগে যারা আছেন, তারা মন-মগয ও চরিত্রে ইসলামী হওয়ার কারণে তারা যদি ইসলামী আন্দোলনে শরীক হন, তাহলে অন্যদের তুলনায় তারা অল্প সময়ে যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হন। তাদের মধ্যে যারা সরাসরি আন্দোলনে যোগদান করেন না, তারাও আল্লাহর আইন কায়েম হওয়ার পক্ষেই জনগণের কাছে মতামত প্রকাশ করেন। ইসলামী শাসন কায়েম হলে খানকাহ ও তাবলীগের লোকই সবার আগে সে আইন মানার জন্য এগিয়ে আসবেন। ইসলামী আন্দোলন আল্লাহর আইন কায়েমের যোগ্য লোক তৈরি করছে। আর মাদরাসা, খানকাহ ও তাবলীগ জায়ামাতে আল্লাহর আইন মানবার যোগ্য জনতা তৈরি করছে। সুতরাং ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে এ কথা ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে যে, ঐ সব দ্বীনি প্রতিষ্ঠান আমাদেরই সহকারী ও সহযোগী শক্তি। সাধারণ অশিক্ষিত জনগণের মধ্যে আল্লাহ, রাসূল (সা.) ও কুরআনের প্রতি যেটুকু

www.amarboi.org

মহব্বত আছে তা ঐ সব প্রতিষ্ঠানের অবদান। তাদের এ বিরাট খেদমতকে ছোট করে দেখা অত্যন্ত অন্যায়।

ঐ সব প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত কিছু লোক ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতা করেন বলে ঐ সব প্রতিষ্ঠানকে এ জন্য দায়ী করা চলে না। যারা বিরোধিতা করেন, তাদেরকে ইসলামের বিরোধী মনে করলে মস্ত বড় ভুল হবে। তারা বিভিন্ন কারণে বিরোধিতা করে থাকেন। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে তাদের বিরুদ্ধে মন্তব্য করা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে। তাদেরকে দ্বীনের খাদেম হিসেবে শ্রদ্ধা করতে হবে। সম্মানের সাথে তাদের সাথে ব্যবহার করতে হবে। ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে তাদের ভুল ধারণা দূর করার উপযোগী বইপত্র তাদের খেদমতে পেশ করতে হবে।

আমরা যদি ইখলাসের সাথে দ্বীনের দায়িত্ব পালন করতে থাকি ও আমাদের আমল-আখলাক যদি ইসলাম অনুযায়ী উন্নত করতে পারি এবং মসজিদের ইমাম, মাদরাসার ওস্তাদ, খানকার পীর, তাবলীগ জামায়াতের মুবাল্লিগদের দ্বারা দ্বীনের যে খেদমত হচ্ছে আমরা যদি এর কদর করি, তাহলে যারা বিরোধিতা করছেন, তারা তাদের ভুল বুঝতে পারবেন। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের মনে রাখতে হবে যে, দ্বীনের সামান্য খেদমতও যারা করছেন, তারাই আমাদের বন্ধু ও সহায়ক। আমরা তাদেরকে মহব্বত করতে থাকলে তারা একতরফা বিরোধিতা কতদিন করবেন? ইসলাম বিরোধী শক্তির মুকাবিলায় তারাই তো ইসলামী শক্তির অংশ।

www.amarboi.org

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য বিশেষ পরামর্শ

শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলনে যারা যোগদান করে শয়তান তাদেরকে তার রাজ্যের দুশমন মনে করে। তাই সে কর্মীদেরকে এ কাজ থেকে ফিরানোর চেষ্টা করে। যখন ফিরাতে পারে না, তখন কর্মীর দিলে এমন সব খেয়াল ঢুকিয়ে দেয় যার ফলে দায়ী ইলাল্লাহর সহীহ জয্‌বা হারিয়ে ফেলে। আন্দোলনের যোশীলা ও উৎসাহী কর্মী হওয়া সত্ত্বেও সঠিক জয্‌বার অভাবে সে এমন আচরণ করে যা আন্দোলনের উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি করে। এ কারণেই দায়ী ইলাল্লাহর সহীহ জয্‌বার পরিচয় ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে।

দায়ী ইলাল্লাহর মনে আল্লাহর গুমরাহ্ বান্দাহদের প্রতি দরদ থাকা জরুরী। এ দরদের ভাবটা এই যে, 'আমাকে তো আল্লাহ পাক দার দ্বীনের পথে চলার তাওফীক দিলেন। কিন্তু যারা এখনও এ পথ চিনল না, তাদের কী উপায় হবে? তাদেরকে দোযখ থেকে বাঁচানোর জন্য আমাকে চেষ্টা করতেই হবে। আমার চেষ্টার ফলে যদি কেউ হিদায়াত পায় তাহলে আমার উপর আল্লাহ্ পাক যে পরিমাণ খুশি হবেন তার চেয়ে বড় সম্পদ আর কিছুই নেই। আল্লাহর এ সন্তুষ্টি হাসিল করার জন্য আমাকে দাওয়াত ইলাল্লাহর কাজ দরদের সঙ্গেই করতে হবে।'

এটাই হলো ইসলামী আন্দোলনের কর্মীর সহীহ জয্‌বা। নবীগণ এ মহান জয্‌বা নিয়েই মানুষকে আল্লাহর পথে ডেকেছেন। এ জয্‌বার অভাব হলে কর্মীর মধ্যে এমন কিছু রোগ সৃষ্টি হয়, যার ফলে তার আচরণ দ্বারা আন্দোলনেরও ক্ষতি হয়ে যায়। যেমন ঃ

১। ইসলাম সম্বন্ধে কিছুদিন পড়াশুনা করার ফলে যখন মোটামুটি জ্ঞান লাভ হয়, তখন কর্মী বেশ উৎসাহ বোধ করে। ইসলাম পরিচিতি, ঈমানের হাকীকত, ইসলামের হাকীকত, নামায-রোযার হাকীকত ও এ জাতীয় কতক বই থেকে ইসলামের উজ্জ্বল আলো পেয়ে সে খুবই মুগ্ধ হয়। ইসলামকে

www.amarboi.org

এমন চমৎকারভাবে বুঝবার ফলে সর্বত্রই এ সব বইয়ের প্রশংসা করতে থাকে। সবাইকে এসব পড়ার জন্য দাওয়াত দেয়।

কিন্তু কোন কোন কর্মীর দ্বারা বাড়াবাড়ি হয়ে যায় তখন, যখন সে আলিম, ইমাম ও পীরদের সম্পর্কে মন্তব্য করতে থাকে যে, এরা ইসলামের কী জানে? এদের মুখে কোনদিন ইসলাম সম্পর্কে এমন সুন্দর ব্যাখ্যা শুনিনি। এরা কালেমাটা পর্যন্ত ঠিক মতো বুঝাতে পারে না। নামায-রোযাকে শুধু পূজা পাঠ বানিয়ে রেখেছে। ইসলামকে শুধু ধর্ম মনে করে। ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে তারা পেশ করে না। এ মোল্লারাই ইসলামকে ডুবাল।'

তার চিন্তা করা উচিত যে, এসব মন্তব্য কি দ্বীনের কোন উপকার হতে পারে? কর্মীর এ আচরণ অনেক দ্বীনদার ও আলিমকে ইসলামী আন্দোলনের বিরোধী বানিয়ে দেয়। তারা তখন প্রচার করেন যে, এ সব বই পড়লে বে-আদব হয় এবং আলেম-উলামার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি নষ্ট হয়। তাই তারা এ সব বই না পড়ার জন্য জনগণকে উপদেশ দেন। তারা মানুষকে ইসলামী আন্দোলন থেকে ফিরিয়ে রাখে। এভাবে কর্মীর ঐ সব বিরূপ মন্তব্য ইসলামী আন্দোলনের বিরাট ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ইসলামের উজ্জ্বল আলোর সন্ধান পাওয়ার পর কর্মীর মনে দরদ থাকলে এ জয্‌বা সৃষ্টি হওয়া উচিত যে, 'আমাদের আলিম সাহেবদের খেদমতে এ সব বই পৌঁছাতে হবে। তারাই তো জনগণের নিকট ইসলামের কথা বুঝান। মসজিদে, খানকায় ও ওয়ায মাহফিলে তারা জনগণের কাছে আরও সুন্দরভাবে ইসলামের শিক্ষা তুলে ধরবার জন্য এ বই থেকে উপকৃত হবেন।'

২। ইসলামী আন্দোলনের মহান নেতা মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র.) এর বিরুদ্ধে যখন কোন আলিম আপত্তিকর কথা বলেন, তখন স্বাভাবিক কারণেই কর্মীদের মনে তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এ বিষয়ে কর্মীদের সবর করা ছাড়া উপায় নেই। বিরোধিতাকারী আলিমদের সম্পর্কে কর্মীরা অনেক সময় মন্তব্য করে বলে যে, 'যে সব বই পড়ে ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা পেলাম এর মহান লেখকের বিরুদ্ধে যারা ফতওয়া দেয় বা অশালীন কথা বলে তাদের কাছ থেকে তো আমরা ইসলামের কোন শিক্ষাই পাইনি। তারা বলেন যে, 'মওদূদীর ইসলাম সঠিক নয়।' যারা এ কথা বলেন, তাদের কাছে কোন ইসলাম আছে কি না তাইতো জানা যায়

www.amarboi.org

না। তারা আমাদেরকে ইসলাম শেখাননি। এখন আমরা শেখার চেষ্টা করছি তাতেও বাধা দিচ্ছেন।'

কর্মীদেরকে মনে রাখতে হবে যে, তারা মাওলানা মওদূদীর (র.) বিরুদ্ধে মন্দ বলার জন্য আল্লাহর কাছে দায়ী হবেন। কিন্তু কর্মীরা তাদের বিরুদ্ধে এ সব মন্তব্য করে আন্দোলনের কী উপকার করবেন? তাদের সম্পর্কে সবর করা ও চুপ করে থাকাই মাওলানা মওদূদীর (র.) নীতি।

আমরা শুধু ইতিবাচক কাজ করে যাব। কোন দ্বীনি মহল সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করা থেকে কর্মীদেরকে সযত্নে বিরত থাকতে হবে। একদিন ইনশাআল্লাহ তাঁদের ভুল ভাঙ্গবে।

৩। যখন ইসলামী আন্দোলনের গুরুত্ব কর্মীদের বুঝে আসে এবং এ কাজ যে সব ফরযের বড় ফরয উপলব্ধি করে, তখন শয়তান তাদের মনে প্রশ্ন সৃষ্টি করে যে, 'তাহলে আলিম হয়েও যারা এ কাজ করে না তারা কেমন আলিম? আর যারা এভাবে ইসলামকে বুঝে না তারা আবার কেমন মুসলমান?'

এ জাতীয় প্রশ্নের ভিত্তিতে কোন কোন কর্মী এমন বিরূপ মন্তব্য করতে থাকে যেন সে মুফতীর দায়িত্ব পালন করছে এবং ফতওয়া দিয়ে বেড়াচ্ছে।

দরদী মনের কর্মী কখনও এভাবে চিন্তা করে না। সে চিন্তা করে যে, 'আমিও তো আগে ইসলামকে বুঝতাম না। আল্লাহর এক বান্দাহ আমাকে বুঝানোর চেষ্টা করেছে বলে আজ আমার বুঝে এসেছে। তাই যারা ইসলামকে সঠিকভাবে বুঝেনি তাদেরকে বুঝানোর দায়িত্ব আমাকেই পালন করতে হবে। আলিম হয়েও এ কাজের গুরুত্ব যে বুঝেননি, তাকে বুঝানোর চেষ্টা করা তাদেরই দায়িত্ব যারা বুঝে।

আমাদের এ কথা মনে রাখতে হবে যে, আমরা দায়ী ইলাল্লাহর দায়িত্ব পালন করছি। কারো উপর ফতওয়া জারীর দায়িত্ব আমাদের নয়। আল্লাহ্ পাকের মেহেরবানীতে আমরা এ পথ চেনার সৌভাগ্য লাভ করেছি। যারা এ পথ এখনও চেনেনি, তাদেরকে আমরা চেনাতে চেষ্টা করলেই আমাদের উপর আল্লাহর ঐ মেহেরবানীর সত্যিকার শুকরিয়া আদায়ের কাজ হবে।

সমাপ্ত

www.amarboi.org

জামায়াতে ইসলামীকে জানার জন্য পড়ুন

জামায়াতে ইসলামীর পরিচয়
১. পরিচিতি- বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
২. বাংলাদেশ ও জামায়াতে ইসলামী
৩. জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য
৪. ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি
৫. জামায়াতে ইসলামীর কর্মনীতি

জামায়াতে ইসলামীর সংগঠন
৬. গঠনতন্ত্র- বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
৭. মেনিফেস্টো- বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
৮. সংগঠন পদ্ধতি- বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
৯. ব্যক্তিগত রিপোর্ট বই (কর্মী ও রুকন)
১০. অমুসলিম নাগরিক ও জামায়াতে ইসলামী
১১. ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচি

জামায়াতে ইসলামীর আন্দোলন
১২. সত্যের সাক্ষ্য
১৩. ইকামাতে দ্বীন
১৪. ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের প্রাথমিক পুঁজি
১৫. হেদায়াত
১৬. ইসলামী আন্দোলন : সাফল্যের শর্তাবলী
১৭. খাঁটি মুমিনের সহীহ্ জযবা
১৮. ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন
১৯. ইসলামী বিপ্লবের পথ
২০. বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ও জামায়াতে ইসলামী
২১. গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও জামায়াতে ইসলামী
২২. মুসলমানদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত কর্মসূচি

জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস
২৩. জামায়াতে ইসলামীর কার্যবিবরণী (১ম ও ২য় খন্ড)
২৪. জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস
২৫. জামায়াতে ইসলামীর সংসদীয় ইতিহাস
২৬. মাওলানা মওদূদী (র.) একটি জীবন একটি ইতিহাস

প্রকাশনা বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
৫০৪/১ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৮৩৫৮৯৮৭, ৯৩৩১৫৮১, ৯৩৩১২৩৯